ইসলাম
ও
আধুনিক
মুসলিম
নারী

মরিয়ম জামিলা

ইসলাম ও আধুনিক মুসলিম নারী

মূল ঃ মরিয়ম জামিলা

অনুবাদ ঃ মোফাচ্ছেল আহমদ

প্রকাশক

মোঃ নেছার উদ্দীন মাসুদ

স্মৃতি প্রকাশনী

৪৫১, মির হাজির বাগ, ঢাকা-১২০৪

ফোন ঃ ৭৪৪২৮০৮, ০১৮১৭১৪৪৫৯৮

প্রকাশকাল

প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ ঈসায়ী

তৃতীয় প্রকাশ ঃ নভেম্বর ২০০৮ ঈসায়ী

কম্পোজ

এ জেড কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স

৪৩৫/এ-২ মগবাজার, ওয়ারলেস রেলগেট

ঢাকা-১২১৭, ফোন ঃ ০১৫৫২৪২৯৬৪৭

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১৮.০০ টাকা

প্রকাশকের কথা

ইসলাম সর্বকালের সকল মানুষের জন্য মহান আল্লাহ প্রদর্শিত জীবন দর্শন, জীবনাদর্শ ও পথ নির্দেশিকা। মানবতার কল্যাণ ও মুক্তি ইসলামেই নিহিত। তাই ইসলামী জীবনাদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা সমাজ ও সভ্যতাই প্রকৃতপক্ষে সুস্থ সমাজ ও সুষ্ঠু সভ্যতা। ইসলামী জীবন দর্শনের বাইরে মানুষের মনগড়া মতাদর্শের ভিত্তিতে যুগে যুগে দেশে দেশে যে সকল সমাজ ও সভ্যতা গড়ে উঠেছে সে সকল সমাজ ও সভ্যতা কোন ক্রমেই কল্যাণমুখী সমাজ ও সভ্যতা হতে পারেনি। বরং হয়েছে প্রকৃতি বিরোধী, বিকৃত ও মানবতা বিধ্বংসী ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতা।

প্রাগৈতিহাসিক কালের আদ, সামুদ, লুত ও ফেরাউনী সভ্যতা, ঐতিহাসিক যুগের গ্রীক, রোম, পারস্য ও ভারতীয় সভ্যতা এবং বর্তমান যুগের বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা খোদাবিমুখ মানবতা বিরোধী বিকৃত সভ্যতারই উদাহরণ।

বিকৃত ও ভ্রষ্ট সভ্যতার একটি সবচেয়ে বড় উপাদান হলো নগ্নতা ও বেহায়াপনা, যা নারী জাতির সতীত্বের অবমাননা করে। এটা মূলতঃই শয়তানী কাজ। আধুনিক বস্তুবাদী সভ্যতা নারী-পুরুষের সমতার নামে পুরুষের সকল অংগনে নারীকে টেনে এনে যেমন মাতৃত্বের সঠিক দায়িত্ব থেকে তাকে সরিয়ে রাখতে চাচ্ছে; তেমনি নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগ দানের দ্বারা গোটা মানব সভ্যতাকেই একটি ভ্রষ্ট পাশবিক সভ্যতায় পরিণত করতে চাচ্ছে। মুসলিম বিশ্ব কিভাবে পাশ্চাত্যের এই ভ্রষ্ট নারীবাদী প্রচারণার শিকার হয়ে নিজ সভ্যতাকে ধ্বংস করছে "ইসলাম ও আধুনিক মুসলিম নারী" শীর্ষক এই বইয়ে সুবিজ্ঞ লেখিকা তা অত্যন্ত সুন্দর যুক্তি ও তথ্যের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন।

উদীয়মান সাহিত্যিক জনাব মোফাচ্ছেল আহমদ অত্যন্ত প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী ভাষায় বইটি অনুবাদ করে তার যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। মহান আল্লাহ তার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

মোঃ নেছার উদ্দীন মাসুদ
৪৫১, মির হাজির বাগ
ঢাকা-১২০৪।

লেখিকার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

মরিয়ম জামিলা ১৯৩৪ সনে নিউ ইয়র্কে জার্মান বংশোদভূত এক আমেরিকান ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে ধনাঢ্য ও ঘনবসতিপূর্ণ উপশহর ওয়েচেষ্টারে তিনি লালিত পালিত হোন এবং সরকারী বিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা লাভ করেন। শৈশবেই তিনি অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে একটু ভিন্ন প্রকৃতির বিদ্যানুরাগী ও নিরতিশয় পড়ুয়া হয়ে ওঠেন। হাতে কোন বই ছাড়া তাকে দেখাই যেত না। তার এই পড়ালেখার পরিধি স্কুল পাঠ্য তালিকা ছেড়ে বহুদূর চলে গিয়েছিল। যখন তিনি কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে পা রাখেন তখন থেকেই তিনি খুব আবেগ প্রবণ হয়ে ওঠেন এবং যৌবনের সকল চপলতাকে অবজ্ঞা করতে থাকেন, যা একজন আকর্ষণীয়-সুন্দরী যুবতীর বেলায় সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর জ্ঞান তৃষ্ণার প্রধান আকর্ষণ ছিল ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান ও জীববিদ্যা। স্কুল ও মহল্লার পাবলিক পাঠাগারগুলো এবং অবশেষে নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরী তার দ্বিতীয় গৃহ হয়ে দেখা দিল।

মাধ্যমিক স্কুল থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভের পর ১৯৫২ সনে তিনি নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে লিবারেল আর্টস প্রোগ্রামে ভর্তি হোন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ১৯৫৩ সনে তিনি ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তার এই অসুস্থতা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে এবং কোন ডিপ্লোমা অর্জন ছাড়াই দু'বছরের মধ্যে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করতে হয়। সরকারী ও বেসরকারী হাসপাতাল সমূহে তিনি দু'বছর (১৯৫৭-৫৯) চিকিৎসাধীন ছিলেন। হাসপাতাল থেকে গৃহে ফেরার পরই তিনি নিজকে আবিষ্কার করলেন একজন লেখিকা হিসেবে। মারমাদুক পিকথলের অনুদিত কুরআন এবং আল্লামা মুহম্মদ আসাদের লেখা দু'টো বই Road to Mecca এবং Islam at the cross roads তাঁর হৃদয়ে ইসলামের প্রতি আগ্রহের আগুন জ্বালিয়ে দেয়। মুসলিম দেশ সমূহের সমসাময়িক কয়েকজন প্রখ্যাত মুসলিম মনিষীর সাথে পত্রালাপ এবং নিউ ইয়র্কে বসবাসকারী কয়েকজন নওমুসলিমের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমে নিউ ইয়র্ক ব্রুকলাইন ইসলামী মিশনে শেখ দাউদ আহমদ ফয়সালের হাতে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হোন। জনাব ফয়সাল তখন তার নাম মার্গারেট মারকিউস থেকে পরিবর্তন করে মরিয়ম জামিলা রাখেন

এরপর তিনি সারা বিশ্বের ইসলামী চিন্তাবিদদের সাথে ব্যাপক পত্রালাপ শুরু করেন এবং ইংরেজীতে প্রকাশিত সকল ইসলামী পুস্তক ও সাময়িকী পড়তে থাকেন। তার এই পড়াশুনার মাধ্যমেই তিনি মাওলানা সাঈয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর চিন্তাধারার সাথে পরিচিত হন এবং ১৯৬০ সন থেকে তার সাথে নিয়মিত পত্র যোগাযোগ শুরু করেন। ১৯৬২ সনের সুরভিত বসন্তে মাওলানা মওদূদী মরিয়ম জামিলাকে পাকিস্তানে চলে এসে লাহোরে তার নিজ পরিবারের একজন সদস্য হিসেবে বসবাস করার জন্য আমন্ত্রণ জানান। মরিয়ম জামিলা তার আমন্ত্রণকে সাদরে গ্রহণ করেন। পাকিস্তানে চলে আসার এক বছর পরে জামায়াতে ইসলামীর একজন সার্বক্ষণিক কর্মী জনাব মোহাম্মদ ইউসুফ খানের সাথে তিনি বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরবর্তীতে এই ইউসুফ খানই তার সকল বইয়ের প্রকাশনার দায়িত্ব নেন। মরিয়ম জামিলা চার সন্তানের জননী। তিনি তার স্বামীর প্রথম স্ত্রীর সাথে একটি বৃহৎ পরিবারে স্বামীর সকল সন্তান ও মুহার্‌রেম আত্মীয়দের সাথে বসবাস করছেন। বিবাহের পরও তিনি তার সাহিত্যকর্ম ও বুদ্ধিবৃত্তিক সকল প্রয়াস খুবই সফলতার সাথে চালিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে তার গুরুত্বপূর্ণ লেখাগুলো গর্ভধারণকালীন এবং দুই গর্ভের মধ্যবর্তী সময়ে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি খুবই কড়াকড়ির সাথে পর্দা পালন করে থাকেন।

বর্তমান ও অতীতের সকল প্রকৃতিসহ নাস্তিকতা ও বস্তুবাদের প্রতি তার সীমাহীন ঘৃণা এবং বিমূর্ত ও অতীন্দ্রিয় ধারণার প্রতি তার নিরবচ্ছিন্ন কৌতুহলই তাকে শেষ পর্যন্ত জ্ঞান ও আবেগের সমস্ত চাহিদা পূরণ করে নির্ভেজাল সরল পথ ইসলামে দীক্ষিত করেছে। ইসলাম তাকে দিয়েছে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে সঠিক নির্দেশনা।

অনুবাদকের কথা

সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থান, দায়িত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্কের ওপরই গড়ে ওঠে সভ্যতার ভিত্তি। কোন সমাজ নারীকে যখনই তার সঠিক অবস্থান থেকে সরিয়ে এনেছে তখনই সে সমাজের বিপর্যয় ঘটেছে।

ইসলাম সমাজে নারী ও পুরুষের যে অবস্থান নির্দেশ করেছে আধুনিক বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে মুসলিম সমাজ সে অবস্থ্যান থেকে অনেক দূরে সরে গিয়েছে। আধুনিক ভ্রষ্ট সভ্যতার লীলাভূমি আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে এক ধনাঢ্য ইহুদী পরিবারে জন্মগ্রহণকারী প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ সু-সাহিত্যিক নওমুসলিম বেগম মরিয়ম জামিলা "Islam and the Muslim women today (ইসলাম ও আধুনিক মুসলিম নারী)" শীর্ষক এই পুস্তিকায় মুসলিম সমাজের এই বিকৃতির চিত্র যেমন এঁকেছেন, তেমনি পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্তঃসার শূন্যতার ইতিবৃত্তও তুলে ধরেছেন খুবই নিপুণভাবে।

নারী ও পুরুষ একই মানব প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত হলেও দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। দৈহিকভাবে পুরুষ সবল, বীর্যবান, প্রবল সাহসী, সৃষ্টি প্রয়াসী, কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। নারী অবলা, দুর্বল, অধিক পরিশ্রম ও প্রতিকুলতার মোকাবিলায় অক্ষম। নিয়মিত মাসিক রক্তস্রাব, গর্ভধারণ ও সন্তান পালনের গুরু দায়িত্বের কারণে গৃহের বাইরে কাজের জন্য সে অনুপযুক্ত

মানসিক দিক থেকে পুরুষ দৃঢ়চেতা, প্রত্যয়দীপ্ত ও সহনশীল নারী আবেগ প্রবণ, দুর্বলচিত্ত ও লজ্জাশীলা।

নারীদেহে রয়েছে চৌম্বক ও ক্ষারীয় পদার্থের আধিক্য। আর পুরুষ দেহে রয়েছে বৈদ্যুতিক ও অম্লীয় পদার্থের প্রাধান্য। তাই চুম্বক ও বিদ্যুতের মধ্যে এবং এসিড ও ক্ষারকের মধ্যে যেমন পারস্পরিক আকর্ষণ প্রবণতা আছে; প্রাকৃতিকভাবে তেমনি নারী ও পুরুষের মধ্যে রয়েছে প্রবল জৈবিক আসক্তি। নারী দেহের আলোকচ্ছটা পুরুষকে যেমন আবিষ্ট করে, পুরুষ দেহের বিদ্যুতাভা নারীকে তেমনি করে বিমোহিত। তাই অবাধ যৌনাচার থেকে বাঁচার জন্য এবং নারীর স্বকীয়তাকে ধরে রাখার জন্য ইসলাম দিয়েছে পর্দার বিধান-ভিন পুরুষ থেকে নিজ দেহ ও চেহারার সৌন্দর্যকে লুকিয়ে রাখার হুকুম।

ইসলাম নারীর আসল কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করেছে তার গৃহে-স্বামীর সংসারে। নারী তার নিজ অবস্থানে থেকেই হতে পারে শিক্ষিতা, গুণবতী, বিদুষী, সমাজ হিতৈষী, জনসেবী ও সংগঠক। ইসলামের সোনালী যুগ এর প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে।

পুরুষ তার স্বাভাবিক যোগ্যতা ও কর্মদক্ষতা দিয়ে ঘরের বাইরের অংগনে যেমন কর্তৃত্ব করবে, নারীও তেমনি তার স্বাভাবিকতার দাবী অনুসারে পর্দার অন্তরালে থেকে মানব সভ্যতার অর্ধেক কাজের আঞ্জাম দিবে।

নারীকে তার প্রকৃতির দাবী অনুযায়ী সঠিক দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে ইসলাম যে কল্যাণময় সমাজ গঠন করেছে, বস্তুবাদী পাশ্চাত্য সভ্যতা তাকেই ধ্বংস করার জন্য "নারী স্বাধীনতা" নামক নিরুর বাঁশী বাজিয়েছে। এই নারী স্বাধীনতাবাদীরা নারীদেরকে স্বাভাবিক লজ্জা ও অবগুণ্ঠন থেকে মুক্ত করে কর্মের সকল অংগনে পুরুষের পাশাপাশি নিয়ে এসেছে। ফলে লিংগের দ্বারা নির্ধারিত মানবিক সকল সম্পর্ক আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হতে চলেছে। সংসার ও পরিবার ভেঙ্গে যাচ্ছে; পিতা-পুত্র ও মাতা-কন্যার সম্পর্ক টুটে যাচ্ছে।

দীর্ঘ দেঁড়শ বছরেরও অধিককাল ধরে মুসলিম বিশ্ব পাশ্চাত্যের দ্বারা শাসিত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে মুসলিম সমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও জীবনাচারের যে অনুপ্রবেশ ঘটেছে, পরবর্তী সময়ে মুসলিম দেশগুলো ভৌগলিকভাবে স্বাধীনতা লাভ করলেও অদ্যাবধি পরাশক্তিগুলোর সে গোলামীর নাগপাশ থেকে মুক্ত হতে পারেনি।

রাজনৈতিকভাবে অধিকাংশ মুসলিম দেশ এখনো মুসলিম নামধারী পাশ্চাত্যের মানস সন্তানদের দ্বারাই পরিচালিত এবং নতুন এই শাসকরা সমাজ ও রাষ্ট্রে প্রায় সব ব্যাপারেই তাদের পশ্চিমা প্রভুদের মুখাপেক্ষী। ফলে ইসলামের কোন মূল্যবোধই এদের দ্বারা নিরাপদ নয়। পাশ্চাত্য শক্তি এদের মাধ্যমে মুসলিম সামজের বিবর্তন চেষ্টায় সদা সচেষ্ট রয়েছে। তাদের অসংখ্য ষড়যন্ত্রের মধ্যে রয়েছে অভাবগ্রস্থদের সাহায্যের নামে এনজিও ও মিশনারী তৎপরতার মাধ্যমে ধর্মান্তর এবং রাষ্ট্র পরিচালনায় আর্থিক সহায়তার অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক বিকৃতি সাধন। সাম্প্রতিক কায়রো ও বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নারী সম্মেলনের প্রস্তাবনাসমূহ এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

মুসলিম দেশগুলোতে পাশ্চাত্যের রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা, দর্শন, সংস্কৃতি, আইন ও বিচার পদ্ধতি পুরাপুরি চালু রয়েছে। শুধু পারিবারিক পদ্ধতি কিছুটা ইসলামিক। এটাকেও ভেঙ্গে দেয়ার জন্য তারা উঠে পড়ে লেগেছে। পর্দা ও পোশাক, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, একাধিক বিবাহ, বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত আইন, পিতা-মাতার অধিকার, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার এবং উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদিকে পাল্টিয়ে দিয়ে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য আইন বিধান চালু করাই তাদের লক্ষ্য। পাশ্চাত্য ও ইসলামী সভ্যতা সম্পর্কে সবিশেষ অভিজ্ঞ লেখিকা উক্তপ পুস্তিকায় এ বিষয়টিকেই অত্যন্ত সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন।

সচেতন পাঠক সমাজের কাছে বইটির এই নিবেদন পৌঁছে দেয়ার জন্যই বইটি বাংলায় রূপান্তরে ব্রতী হয়েছি। বাংলা ভাষা-ভাষী মুসলিম সমাজ, বিশেষ করে বৈরী পরিবেশে বেড়ে উঠা বর্তমান প্রজন্মের নারী ও পুরুষ এই বইয়ের মাধ্যমে কোন এক মাত্রায় পথের দিশা পেলেই আমার পরিশ্রম সার্থক হবে, ইন্‌শাআল্লাহ।

মোফাচ্ছেল আহমদ

২৮.১২.৯৫।

সূচিপত্র

* মুসলিম নারীর সামাজিক দায়িত্ব ৯

* মা হিসেবে মুসলিম নারীর দায়িত্ব ১২

* নারী স্বাধীনতা ও কাসেম আমীন ১৭

* নারী স্বাধীনতা ও ইসলাম ২২

* নারী সমবাদী আন্দোলন ও মুসলিম নারী ৩০

মুসলিম নারীর সামাজিক দায়িত্ব

আধুনিক জীবন যাত্রার শ্রেষ্ঠত্বে যারা বিশ্বাসী তারা (১) কন্যাদের বিবাহে অভিভাবকত্ব, (২) বহু বিবাহ, (৩) তালাক ও (৪) পর্দা প্রথার মত ইসলামী মূল্যবোধকে নারী জাতির সামাজিক মর্যাদার হানিকর জ্ঞান করে থাকেন।

বিশ্বের সকল মুসলিম দেশেই অধুনা "সংস্কার আন্দোলন" নামে একটি আন্দোলন চলছে যা ইসলামের প্রারম্ভকাল থেকে ইসলামী বলে বিবেচিত বিধানগুলোকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চায় এবং সে সকল ক্ষেত্রে অমুসলিম দেশগুলোতে প্রচলিত বিধানকেই চালু করতে চাচ্ছে।

এই নিবন্ধে আমি তাই নারী জাতি সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষার স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং এ ব্যাপারে তাদের ওপর অন্যায় আচরণ যে মারাত্মক সামাজিক ক্ষতির কারণ তা সবিস্তারে বর্ণনা করব। আধুনিক নারী সাম্যবাদীরা মুসলিম বালিকার স্বামী নির্বাচনে পিতা-মাতা কিংবা অভিভাবকের মতামতের প্রাধান্যকে খুবই দুঃখজনক বলে মনে করেন এবং এটাকে তারা তার প্রতি পিতার নিষ্ঠুর জুলুম ও ব্যক্তি স্বাধীনতার হস্তক্ষেপ বলে বর্ণনা করেন। তারা বহু বিবাহের মত ইসলামের অন্য কোন বিধানকেই এত খারাপভাবে নিন্দা করেননি। একে তারা মুসলিম নারীত্বের চরম অবমাননা ও স্বেচ্ছাচারী কামুকতার প্রমাণ হিসেবে পেশ করেছেন। এই "সংস্কারবাদীরা" একে কেবল চরম অধঃপতিত সমাজের জন্যই উপযুক্ত প্রথা বলে মনে করেন এবং একে শুধুমাত্র বিশেষ ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থাতেই মেনে নেয়া যায় বলে দাবী করেন।

আমাদেরকে অবশ্যই বুঝতে হবে যে, আমাদের এই আধুনিকতাবাদীদের এহেন দুঃখজনক স্বীকারোক্তির ভিত্তি আদৌ কুরআন কিংবা হাদীসে নেই। এটা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তাদের মানসিক দাসত্বের ফলশ্রুতি।

পাশ্চাত্য সমাজ যে তীব্র ঘৃণার সাথে বহু বিবাহ প্রথাকে দেখছে তার কারণ হলো তারা একাকিত্বের একটি অতিরঞ্জিত ধারণার দ্বারা অধিক মাত্রায় প্রভাবিত এবং সে ক্ষেত্রে তারা ব্যভিচারকেও তেমন বীভৎস মনে করেন না।

এটা অত্যন্ত লজ্জা ও দুঃখের ব্যাপার যে, অনেক মুসলিম প্রধান দেশেও ইসলামের পারিবারিক বিধানকে এমনভাবে অংগচ্ছেদ করা হয়েছে যে, তাদের সমকালীন আইনে নবী (স), তাঁর সাহাবায়ে কেরাম (রা) ও অন্যান্য মহাপুরুষগণ যাঁরা একাধিক বিবাহ করেছেন তাঁদেরকে অপরাধী হিসেবেই সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে। তালাক সম্পর্কিত ইসলামী আইনকেও তারা বহু বিবাহ প্রথার মত কর্কশভাবে অভিযুক্ত করেছেন। কোন ব্যক্তিকে শরীয়ত কর্তৃক তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অনুমতি প্রদানকে ইসলামী আইনে নারী জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করার আর একটি প্রমাণ হিসেবে তারা উল্লেখ করছেন। তারা একথা জোরে শোরেই বলছেন যে, তালাকের মত এক তরফা স্ত্রী প্রত্যাখ্যান অবশ্যই ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। কারণ এটা খুবই সামান্য ও তুচ্ছ কারণে কাউকে তার স্ত্রী পরিত্যাগের অনুমতি প্রদান করে। সুতরাং তালাক অবশ্যই একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং ব্যভিচার ও দুরারোগ্য পাগলামীর মত কোন মারাত্মক অবস্থার উদ্ভব হলেই শুধু কোর্টের অনুমোদন সাপেক্ষে কাউকে তালাক দেয়া যেতে পারে।

যেখানে ইসলামী শরীয়ত পারস্পরিক সহাবস্থানে অসহনশীল একটি অসুখী দম্পতিকে তাদের সমস্যার একটি সুন্দর ও সম্মানজনক সমাধানের ব্যবস্থা প্রদান করেছে, সেখানে ঐ সকল "সংস্কারবাদীরা" বলছেন যে, এই অসঙ্গত মেজাজের দু'টো নারী-পুরুষকেও তাদের বিবাহ বন্ধনকে ধরে রাখতে বাধ্য করতে হবে।

দু'জন নারী-পুরুষ যদি পারস্পরিক সন্তুষ্টি খুঁজে না পায় তবে কোন ধর্মহীন নৈতিকতাই যেহেতু তাদের একে অপরকে ভালোবাসতে বাধ্য করতে পারে না, সুতরাং তারা অন্যত্র এ ভালবাসা খুঁজবেই। পারস্পরিক অসন্তুষ্টিপূর্ণ এ দুঃসহ সহাবস্থান থেকে মুক্তি পেতে তাদের একটি মাত্র উপায় থাকে, তা হলো মিথ্যা ও কুৎসার মাধ্যমে তালাকের জন্য কোর্টকে প্ররোচিত করা, আর যেহেতু এই মিথ্যা অপবাদ তাদের জন্য সামাজিক গ্লানির কারণ হয়, সেহেতু পুরো ব্যাপারটাই তাদের নৈতিক অধঃপতন ও ধ্বংস ডেকে আনে।

কোর্টে প্রমাণযোগ্য যথার্থ কারণ ছাড়া যে তার স্ত্রীকে তালাক দেয় সে খারাপ লোক বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু মানসিক পীড়নের মধ্যে আজীবন ধরে না রেখে মেয়ে লোকটিকে পছন্দমত বিবাহ বন্ধনের সুযোগ দেয়া যেকোন

মানবিক বিচারেই খারাপ হবার নয়। তথাপি আমাদের আধুনিক সংস্কারবাদীরা এহেন অবস্থায়ও নারীটিকে আজীবন ঝগড়া-ঝাটি ও মানসিক পীড়নের মধ্যে রাখার জন্য আইন তৈরিতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

পর্দা বা নারী-পুরুষের অবাঞ্ছিত মেলামেশা থেকে পৃথকীকরণ ব্যবস্থাকেও আধুনিক শিক্ষিতরা মোটেই কম ক্রোধের দৃষ্টিতে দেখছেন না। তারা অমুসলিমদের মতই নারী দেহের অবগুণ্ঠন উন্মোচনে বদ্ধপরিকর। তাই তারা নারীদের জন্য সহশিক্ষা, ভোটাধিকার, দেশের বাইরে চাকরি গ্রহণ এবং সাধারণ্যে সকল কাজে পূর্ণাঙ্গ অংশগ্রহনের ব্যবস্থা করছেন।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বশীলদের প্রবর্তিত এই "নারী স্বাধীনতার" সর্বোচ্চ চিত্র হলো- রাজপথে নেকাব উন্মোচিত মেয়েদের জাতীয় সংগীতের তালে তালে ব্যানার দুলিয়ে উন্মত্ত কুচকাওয়াজ, নির্বাচনে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের ভোট প্রদান, সেনাবাহিনীতে পুরুষ সৈনিকের পোশাকে সজ্জিত নারী, কল কারখানায় পুরুষের সাথে কর্মরত মেয়েলোক এবং আনন্দ মেলার উপহার বিপণীর সজ্জিত পশুর মত জাতীয় সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিচারকগণ কর্তৃক আগত সুন্দরী ললনাদের দেহ ও সৌন্দর্য চোখে দেখার দৃশ্য।

আধুনিক সভ্যতায় নারীর সম্মান ও শ্রদ্ধার মাপকাঠি নির্ধারিত হয়ে থাকে পুরুষের সকল কাজে তার অংশগ্রহণ এবং সেই সঙ্গে তার সকল সৌন্দর্য ও মাধুর্যকে উন্মুক্ত করার মাধ্যমে। ফলে সমসাময়িক ঐ সমাজে নারী ও পুরুষের উভয়ের পার্থক্য নির্ধারক সকল কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণরূপে গুলিয়ে যায়।

ইসলামী শিক্ষা এই ধরনের বিপথগামী যৌনতামূলক সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে কিছুতেই বরদাশত করতে পারে না।

ইসলাম নারীকে পুরুষের অঙ্গনে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয়নি। তার দায়িত্ব নির্ধারিত হয়েছে তার ঘরে, তার স্বামীর সংসারে। তার সার্থকতা ও সফলতা নির্ধারিত হয়েছে স্বামীর প্রতি তার আনুগত্য ও বিশ্বস্ততা এবং মানিক-রতন সন্তানদের লালন পালনের মধ্যে। সকল মুসলিম নারীরই পছন্দের বিষয় হলো গোপনীয়তা, আর এ জন্য পর্দাই হচ্ছে অপরিহার্য মাধ্যম।

জীবন নাট্যের যে দৃশ্যে পুরুষ হবেন ইতিহাসের নায়ক সে পটভূমিকায় পর্দার অন্তরালে নারী হবেন তার সকল কর্মকাণ্ডের সহায়ক। নারীর এই কর্মকাণ্ড কম উত্তেজক হলেও অধিকতর বিনম্র এবং সুষ্ঠু জীবন ধারার স্থিতিশীলতা, বিকাশ ও পবিত্রতা রক্ষায় তা কোনমতেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

মা হিসেবে মুসলিম নারীর দায়িত্ব

একজন মুসলিম জননীর প্রাথমিক দায়িত্ব হল সন্তানদেরকে কুরআন ও সুন্নাহর শিক্ষা অনুযায়ী চলতে অনুপ্রাণিত করা।

অনারবীয় এলাকায় যে সকল মুসলিম নারী প্রত্যহ সকালে ভক্তিভরে কুরআন তিলাওয়াত করেন তাদের অধিকাংশই তার সামান্যতম অর্থও জানেন না, কিংবা জানার চেষ্টাও করেন না।

ধর্মীয় ঝোঁক প্রবণ অথচ আধুনিক শিক্ষায় গড়ে ওঠা অনেক মেয়েই কুরআন, হাদীস ও ইসলামী সাহিত্য অধ্যয়ন করে থাকে। কিন্তু এগুলোকে তারা নোবেল নাটকের মতই ভাবে, কিংবা ভাবে কোন বিমূর্ত দর্শন হিসেবে। ইসলাম সম্পর্কিত এই পড়াশুনা তাই তাদেরকে এক মুহূর্তের জন্যও নোংরা ছায়াছবি দর্শন, অশ্লীল সংগীত শ্রবণ ও গানের তালে তালে অংগভংগি প্রদর্শন কিংবা অশালীন দেহ-- আঁটা পোশাক পড়ে সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখতে সমর্থ হয় না।

এক্ষেত্রে মুসলিম মায়েদের কর্তব্য তাদের বেড়ে ওঠা ছেলে মেয়েদেরকে এ কথা বুঝানো যে, স্কুল-কলেজে তাদের অন্যান্য বন্ধু-বান্ধবীরা যা করছে তা আসলে ঠিক নয়। মুসলিম নারী কুরআন-হাদীস পড়বেন এই উদ্দেশ্যে যেন তাদের দৈনন্দিন জীবনে তার শিক্ষা বাস্তবায়িত হয়।

অনেক মুসলমানের ঘরেই দেখা যায়, তাকের ওপরে সুন্দর সিলকের কাপড়ে আবৃত করে কুরআন শরীফ রেখে দেয়া হয়েছে, যেন ময়লা পড়ার জন্যই। অব্যবহৃত এই অসংখ্য কুরআন আর্তি করে বলছে "ওহে মানুষ আমাকে বন্ধন মুক্ত কর, আমাকে পড়, আমাকে অনুসরণ কর।"

যে মায়েরা মহিলা বিষয়ক পত্রিকাদি পড়তে অভ্যস্ত তারা সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রতি তাদের যুব সন্তানদের তীব্র বিদ্রোহাত্মক দৃষ্টিভংগিকেও সহজেই সমর্থন করে বসেন। এমনকি তাদের নির্বোধ, ঘৃণ্য আচরণ ও তুচ্ছ চপলতার প্রতি তীব্র আকর্ষণ এবং গতানুগতিকতার প্রতি সর্বাত্মক অনিহাকেও তারা প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন। এই

মায়েরা মনে করেন, "নাস্তিকতা ও বস্তুবাদ হচ্ছে যুব কিশোরদের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত এক জৈবিক বাস্তবতা। একে তারা একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন হিসেবে গ্রহণ করবেই। সুতরাং তাদেরকে এ সর্বব্যাপী ঝোঁক প্রবণতার ওপর ছেড়ে দেয়াই উচিত।"

এটা সম্পূর্ণ একটি প্রতারণাপূর্ণ কথা। এর কোন যৌক্তিকতাই থাকতে পারে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তথাকথিত প্রগতিবাদীদের প্রচার প্রচারণাই তাদেরকে এ নৈরাশ্যের মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

গণ মাধ্যমগুলোতে তারা যা শোনে ও দেখে এবং তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা যা শেখে, তাদের গৃহে আচরিত কিংবা শিখানো মূল্যবোধের সাথে তার কোন মিল না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠে। এসব গণমাধ্যম যদি পাশ্চাত্য জীবন-পদ্ধতি শিক্ষা না দিয়ে ইসলামী জীবন ধারার শিক্ষা দিতো তাহলে এই যুবক-যুবতীরা চিন্তা-বিশ্বাস এবং অনুভূতি ও আচরণে সম্পূর্ণ বিপরীত হতে পারতো। এই অত্যাবশ্যকীয় পরিবর্তন সাধনে শিক্ষিত জননীরাই কেবল তাদের সন্তানদের ওপর পরম কার্যকরী প্রভাব খাটাতে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারেন।

পর্দা সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষার দাবীই হচ্ছে মহিলাগণ ব্যক্তিত্ব ও সম্মানের সাথে একাকিত্বে বাস করবেন, নিতান্ত প্রয়োজনে আত্মীয়-স্বজন ও পুরুষ বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাক্ষাতের জন্য বের হওয়া ছাড়া অধিকাংশ সময় তারা নিজ গৃহে অবস্থান করবেন। একজন মা তার বেড়ে ওঠা সন্তানদের সামনে তার ব্যক্তি জীবনে অনুশীলিত কার্যাদির দ্বারাই সুন্দর উদাহরণ উপস্থাপন করতে পারেন। যে জননী সর্বদা তার ঘর-কন্যার কাজে নিজেকে সাচ্ছন্দ রাখেন, রান্না-বান্না, তদারকী ও শিশুদের পরিচর্যায় ব্যাপৃত থাকেন, নিয়মিত নামায পড়েন, কুরআন অধ্যয়ন ও অন্যান্য ইবাদাত বন্দেগীর কাজে ব্যস্ত থাকেন, তিনিই তার পরিবারে এমন একটি অনুকূল ইসলামী পরিবেশ সৃষ্টি করতে সক্ষম, যার দ্বারা তার শিশু সন্তানেরা গভীরভাবে প্রভাবিত হবে এবং বয়ঃবৃদ্ধির সাথে সাথে সে যখন বাইরের পরিবেশে মিশবে তখন অবাঞ্ছিত আচরণ দ্বারা আকৃষ্ট হবে না। এ জন্য খুব অল্প বয়স থেকে শিশুদের ইসলামী শিক্ষা প্রদান করা উচিত। হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, রসূল (স) এঁর সাহাবা-ই-কেরাম (রা) এঁর সন্তানগণ এমনকি নেংটা থাকাকালীন বয়সেও কুরআন আবৃত্তি করতে পারতেন।

শিশুরা যখন কথা বলতে শিখে তখনই তাকে কালিমা শিক্ষা দেয়া উচিত এবং বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ প্রভৃতি ইসলামী ভাবাবেগপূর্ণ কথামালাও শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন। শিশু যখনই দাঁড়াতে ও হাঁটতে শিখে তখনই মায়ের অনুকরণে তাকে নামাযের মহড়া করতে অনুপ্রাণিত করা উচিত। শিশুর বয়স যখন সাত বছর হবে তখন মায়েদের উচিত তাদেরকে নামায পড়তে চাপ দেয়া এবং দশ বছর বয়সেও নামায না পড়লে শিশুদের শাস্তি দেয়া প্রয়োজন। এভাবে শিক্ষা দিলেই শিশুরা বুঝদার হওয়ার অনেক আগে থেকেই স্রষ্টা ও মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে।

বয়স ও মেধা অনুসারে এ সকল কর্তব্য পালনের গুরুত্ব সম্পর্কে শিশুদেরকে সহজ-সরল ও পরিষ্কার ব্যাখ্যা প্রদান করা উচিত। এ ক্ষেত্রে মায়েদের কর্তব্য শিশুদেরকে অতীত ও বর্তমানের মুসলিম মহৎ ব্যক্তিত্বের রোমাঞ্চকর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে পরিচিত করে তোলা এবং তাদের নিজেদের জীবনে ঐ সকল মূল্যবোধ মেনে চলার তীব্র আকাংখা সৃষ্টি করা। শিশুরা যখন একটু বড় হয়ে ওঠে এবং নিজেরা ইচ্ছা করে বই পুস্তক পড়তে পারে, তখন বাসগৃহের পরিবেশে এমন সব ইসলামী বই পুস্তক রাখা প্রয়োজন যা শিশুদেরকে পড়তে আকৃষ্ট করে।

যে সব ছেলেমেয়ে বেশ বড় হয়েছে কিংবা যৌবনে অবতীর্ণ হয়েছে তাদেরকে প্রেক্ষাগৃহের নোংরা ছায়াছবি ও রেডিও-টিভির অর্থহীন প্রোগ্রামগুলো কেবল দেখতে নিষেধ করলেই চলবে না বরং সেগুলোর খারাপ দিকটা তাদেরকে ব্যাখ্যা করে বুঝাতে হবে। ঘরে যদি রেডিও অথবা টেলিভিশন সেট থাকে তবে মায়েদের উচিত তার কুরআন তিলাওয়াত, সংবাদ বুলেটিন, ভাল কবিতা আবৃত্তি ও স্বাস্থ্য শিক্ষা প্রোগ্রামগুলো ছাড়া অন্য সব প্রোগ্রাম শোনা থেকে সন্তানদেরকে সম্পূর্ণ বিরত রাখা। কোন অবস্থাতেই শিশুদেরকে পপ সঙ্গীত শুনতে দেয়া উচিত নয়। কারণ শিশু চরিত্রের ওপর এর চেয়ে খারাপ নৈতিক প্রভাব ফেলার মত আর কোন প্রোগ্রামই নেই। যদি শিশু কখনো প্রতিবেশীর রেডিও-টিভি থেকে শুনে এ সকল খারাপ গান গাইতে শুরু করে তবে মায়েদের উচিত তাদেরকে চুপ থাকতে বাধ্য করা এবং এসব নোংরা গান গাইতে লজ্জাবোধ থাকা উচিত বলে ধিক্কার দেয়া।

মুসলিম মায়েদের কোন অবস্থাতেই তাদের সন্তানদেরকে খৃস্টান মিশনারী স্কুলে বা আশ্রমে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে পাঠাতে সম্মত হওয়া উচিত নয়। কারণ সেগুলোতে ছেলেমেয়েরা খৃস্টধর্ম ও সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হবেই। এমনকি সরকারি স্কুলগুলোতেও নৈতিক শিক্ষার জন্য তেমন ভাল ফল আশা করা যায় না।

তাই এ ক্ষেত্রে সামর্থ থাকলে গৃহ শিক্ষকের মাধ্যমে কিংবা অসমর্থ হলে মসজিদে পাঠিয়ে ছেলেমেয়েদেরকে আরবী ভাষা, কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা প্রদানের সাহায্যে বস্তুবাদী শিক্ষার প্রতিপূরণ করা যেতে পারে। পারলে মা নিজেও তার সন্তানদেরকে এ ধরনের শিক্ষা দিতে পারেন।

প্রত্যেক মায়ের উচিত বাচ্চাদের স্কুল পাঠ্য সমস্ত টেক্স বই ভালভাবে পড়ে দেখা। এগুলোতে যেসব বিষয় অসত্য, ভুল ও ক্ষতিকারক তা বাচ্চাদেরকে ধরিয়ে দেয়া এবং নিঃসন্দেহ প্রমাণে সেগুলোর অসত্যতা বুঝিয়ে দেয়া।

মুসলিম মায়েদের উচিত তার সাধ্যের সীমার মধ্যেই বাসগৃহকে আকর্ষণীয় করে তোলা। এ দেশের প্রায় সকল গৃহই, এমনকি মধ্যবিত্তের ঘরবাড়ীও অনেক ক্ষেত্রে অপরিচ্ছন্ন ও নোংরা। অনেক মহিলাই মেঝেতে, বিশেষ করে উঠোন ও রান্না ঘরে ময়লা আবর্জনা ছড়িয়ে রাখেন। তাদের এ একটা খারাপ অভ্যাস যে, তারা ময়লার মধ্যে থাকবেন তবুও নিজ হাতে তা পরিষ্কার করবেন না। ইসলামী শিক্ষা মেয়েদেরকে অবশ্যই পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মানুবর্তিতা শিখায়। নিজেদের হাতে ঘরদোর ঝাড়ু দিতে কিংবা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করতে মুসলিম নারীকে কখনোই লজ্জাবোধ করা উচিত নয় এবং চাকর-চাকরানীদের ওপরও সব সময় এ ব্যাপারে নির্ভরশীল হওয়া ঠিক নয়। যদি সম্পদশালী হন তবে সর্বদা জাঁক-জমক ও অপচয় এড়িয়ে চলতে হবে এবং পশ্চিমা ধাঁচের সোফা, ড্রেসিং টেবিল, খেলোগয়না ইত্যাদি ব্যয় বহুল গৃহসামগ্রী পরিহার করতে হবে। কুরআন ও হাদীসের বাণী সম্বলিত কারুকার্যপূর্ণ ক্যালিগ্রাফী দিয়ে ঘরের দেয়াল সজ্জিত করা যেতে পারে। এতে একদিকে যেমন ঘর সাজানো হবে অন্যদিকে তা সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে, এটা একটি মুসলিম বাসগৃহ। ইসলামী শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক ধরনের ছবি, পারিবারিক কিংবা বন্ধু-বান্ধবের একক ও গ্রুপ ফটোগ্রাফ ইত্যাদি কিছুতেই ফ্রেমে আটকিয়ে ঘরে টাঙিয়ে রাখা ঠিক নয়।

ইসলামী শিক্ষা একজন বালিকাকে গৃহকর্মের জন্য অন্তত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মূল্যনীতি, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং মজাদায়ক হালাল খাদ্য তৈরির পদ্ধতি শেখায়। অনেক মুসলিম নারীই খাদ্যের পরিপুষ্টি জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই প্রয়োজনীয় ও উপযোগী প্রচুর খাদ্য হাতের কাছে থাকতেও তারা তাদের বাচ্চাদেরকে তা খাওয়াতে জানেন না।

একজন অশিক্ষিত ও উদাসীন মুসলিম নারী কিছুতেই অনৈসলামিক প্রভাব যা দিবারাত্র তার সন্তানকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে তা প্রতিহত করতে পারেন না। শুধুমাত্র একজন শিক্ষিত, চতুর ও অত্যন্ত আগ্রহশীল মুসলিম নারীই পারেন বর্তমান প্রতিকুল পরিবেশের সামনে সাহসের সাথে মুখোমুখি হতে।

নারী স্বাধীনতা ও কাসেম আমীন

নারী ও পুরুষের যৌন পবিত্রতার সংরক্ষণ, পর্দা করা, মেয়েদেরকে বিশ্বস্ত স্ত্রী হিসেবে গৃহে অবস্থান করা, সন্তান পালনে ও ঘরণীর কাজে নারীকে নিয়োজিত থাকা, স্বামীকে পরিবারের কর্তা ও জীবিকা উপার্জনকারী হিসেবে মেনে নেয়া, স্ত্রী-তালাক ও বহু বিবাহে পুরুষের অধিকার থাকা প্রভৃতি প্রথাগুলো মুসলিম সমাজে মহানবী (স), তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও ইমামদের যুগ থেকে দীর্ঘ তেরশত বছরেরও অধিককাল ধরে অনুশীলিত হয়ে আসছে। কোন ফকিহ কিংবা কোন মাযহাবের কোন আলেমই এ ব্যাপারে কখনো কোন প্রশ্ন তোলেননি। সকলেই নির্দ্বিধায় এ বিধানগুলো মেনে নিয়েছেন। ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম বিশ্বের স্বাধীনতা কেড়ে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোন নামধারী মুসলিমও কোরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত মুসলিম নারীর এই সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে কোন কটাক্ষ করার সামান্যতম সাহসও পায়নি।

ইতিহাসে প্রথম যে মুসলিম নামধারী ব্যক্তি পর্দা প্রথার বিরুদ্ধে কথা তোলেন তার নাম কাসেম আমীন (১৮৬৫-১৯০৪)। কাসেম আমীন ছিলেন একজন কুর্দী। পেশায় বিচারক। তিনি শেখ মোহাম্মদ আবদুহের শিষ্য ছিলেন। তিনি তার জীবনের অধিকাংশ সময় কায়রোতে অতিবাহিত করেন। তার ফার্সী ভাষা শিক্ষাকালে খৃস্টান মিশনারীদের প্রচারণায় তার মনে বিশ্বাস জন্মে যে, পর্দা, বহুবিবাহ ও তালাক প্রথা মুসলিম সমাজের পিছিয়ে যাওয়ার একমাত্র কারণ। এই ফরাসী শিক্ষা যতই তাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎকৃষ্টতার পক্ষে যুক্তি দেয়, ততই তার নিজের সম্পর্কে নিকৃষ্টতার ধারণা জমতে থাকে। পরবর্তীতে তিনি লিখেন, "সত্যিকার সভ্যতা হবে বিজ্ঞান নির্ভর। সত্যিকার বিজ্ঞানের বিকাশের পূর্বেই ইসলাম যেহেতু তার পূর্ণতায় পৌছেছে; সুতরাং একে সভ্যতার উৎকর্ষ ধরা যায় না।" তিনি আরো বলেন যে, ইসলামের নৈতিক ভিত্তি দুর্বল। তিনি বলেন, "মুসলমানগণ, এমনকি মহানবী (স)-এর সময়ের মুসলমানগণও অন্য লোকদের চেয়ে কোন দিক দিয়ে ভাল ছিল না।" তার মতে, "পূর্ণতা ও চরম শ্রেষ্ঠত্বের পথ হল বিজ্ঞান। ইউরোপ বিজ্ঞানে যত বেশি অগ্রবর্তী হয়েছে, সামাজিক শ্রেষ্ঠত্বেও তত বেশী এগিয়ে গেছে।" তিনি আরো লিখেন, "ইউরোপ

সকল দিক দিয়েই আমাদের থেকে অগ্রবর্তী। যদিও আমরা ভেবে আনন্দ পাই যে, ইউরোপীয়রা বস্তুগতভাবে আমাদের চেয়ে সম্পদশালী হলেও নৈতিক দিক দিয়ে আমরা তাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর; কিন্তু কথাটি ঠিক নয়। ইউরোপীয়রা আমাদের চেয়ে নৈতিক দিক দিয়ে অনেক বেশী অগ্রগামী। তাদের সকল শ্রেণীর মধ্যেই সামাজিক নৈতিকতা রয়েছে। ইউরোপে নারী স্বাধীনতাও কোন প্রথা বা অনুভূতি থেকে সৃষ্টি হয়নি। বরং তা বিজ্ঞান ও নৈতিকতা নির্ভর। তাই ইউরোপীয় বিজ্ঞানকে এর নৈতিক দিকটিকে বাদ দিয়ে গ্রহণ করা অর্থহীন। এ দু'টো জিনিস অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কশীল। সুতরাং আমাদের জীবনের সকল দিক ও বিভাগে পরিবর্তন সাধনের জন্য প্রস্তুত হওয়া উচিত।"

এই চিন্তাধারাই কাসেম আমীনকে ১৯০১ সালে পর্দা প্রথা বিরোধী 'দি নিউ ওম্যান' নামক বইটি লিখতে উদ্বুদ্ধ করে। এই বইয়ে তিনি মুসলিম পারিবারিক জীবনকে ভীষণ খারাপভাবে চিত্রিত করেছেন। স্যামুয়েল জেমার নামক একজন পাশ্চাত্য লেখকের 'চাইল্ড হুড ইন দি মোসলেম ওয়ার্ল্ড' নামক বই থেকে কাসেম আমীন তার বইয়ে এভাবে উদ্ধৃতি টেনেছেন যে, "মুসলিম সমাজে পুরুষ হল নারীর নিরংকুশ প্রভু। নারী তার আনন্দের বস্তু, যেমন একটি খেলনা, যা নিয়ে সে যেমন ইচ্ছা খেলতে পারে। জ্ঞান সমস্ত পুরুষের, আর নারী নির্বোধ, সব অজ্ঞতা তার জন্য। মুক্ত আকাশ ও সব আলো পুরুষের জন্য, আর নারীর জন্য সকল অন্ধকার ও বন্দীদশা। পুরুষ শুধু আদেশ করবে, আর নারী তা নীরবে মেনে চলবে। সব কিছুই পুরুষের, আর নারী তার এই সব কিছুর একটি তুচ্ছ অংশ মাত্র।" এই কাসেম আমীনই হলো মুসলিম নামধারী প্রথম ব্যক্তি যে মুসলিম পরিবারকে পশ্চিমা ধাঁচে পুনর্বিন্যাস করে গড়ে তোলার পরামর্শ দেন। এ প্রসঙ্গে তিনি তার বইয়ে আলবার্ট হোরানীর, "এরাবিক থট ইন দি লিবারেল এজ" নামক বই থেকে এভাবে উদ্ধৃতি টানেন যে, "প্রাচ্য দেশগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ, দেখবে নারীরা পুরুষের নিকট দাসত্বের শিকলে বন্দী হয়ে আছে। পুরুষরা তাদের শাসক। পুরুষ অত্যাচারী এবং সে যতক্ষণ ঘরে থাকে ততক্ষণ সে এই অত্যাচার চালাতে থাকে। পক্ষান্তরে তাকিয়ে দেখ ইউরোপীয় দেশগুলোর দিকে, সেখানে প্রতিটি সরকার মানুষের স্বাধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করেছে এবং নারীকে দিয়েছে চিন্তা ও কাজে উচ্চতর স্বাধীনতা ও সম্মান।"

কাসেম আমীন উক্ত বইয়ে আরো লিখেন, "মুসলমানদের অধঃপতনের মূল কারণ হলো, অজ্ঞতার কারণে সামাজিক মূল্যবোধের বিনাশ সাধন। এই অজ্ঞতা শুরু হয় পরিবার থেকে। এই অবস্থার উন্নতির জন্য পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন প্রয়োজন। এই শিক্ষার মাধ্যমে নারী শুধু পারিবারিক সমস্যা থেকেই বাঁচবে না, বরং পুরুষ উৎপীড়কের হাত থেকে বাঁচার জন্য নিজেকে সাবলম্বী করতেও পারবে। এই শিক্ষা নারীকে অবগুন্ঠন, নির্জনবাস ও উৎপীড়ন থেকে মুক্তি দিবে।" নারীর গৃহে অবস্থানকে কাসেম আমীন এই বলে ক্ষতিকর মনে করেন যে, এটি নারীর প্রতি পুরুষের অবিশ্বাস থেকেই উৎসারিত। পুরুষ নারীকে শ্রদ্ধা করে না, তারা তাদেরকে গৃহে বন্দী করে রাখে। কারণ, তারা নারীকে পুরোপুরি মানুষ বলেই স্বীকার করে না। পুরুষ নারীর মানবীয় গুণাবলীকে অস্বীকার করে এ জন্য যে, সে শুধু নারীর দেহকেই ভোগ করতে চায়। বহু বিবাহ সম্পর্কেও কাসেম আমীন একই ধারণা পোষণ করেন। তার মতে, কোন নারীই পারে না তার স্বামীকে অন্য নারীর সাথে অংশীদার করতে। যদি কোন পুরুষ দ্বিতীয় বিবাহ করে, তবে তা তার প্রথম স্ত্রীর ইচ্ছা ও আকাংখাকে অগ্রাহ্য করেই সম্ভব। তালাক প্রথাকেও তিনি ঘৃণার সাথে দেখেন। তিনি বলেন, যদি এই প্রথা চালুই রাখা হয়, তবে নারীকেও এ ব্যাপারে সমঅধিকার দিতে হবে। তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীরা পুরুষের সমঅধিকার না পাবার কোন যুক্তি নেই বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। তবে তিনি নারীদের রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের পূর্বে সুদীর্ঘকাল শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত বলে জোর দেন।

কাসেম আমীনের 'দি নিউ ওম্যান' আধুনিক মুসলিম নারীকে খৃস্টান ও মানবতাবাদী আদর্শের শৃংখলে বন্দী করার এক সুস্পষ্ট ঘোষণা। যে কেউ এ বই পড়বে তাকে বাস্তবিকই বিশ্বাস করতে কষ্ট হবে যে, এর লেখক একজন মুসলমান, কোন খৃস্টানধর্ম প্রচারক নন।

মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে 'দি নিউ ওম্যান' পুস্তকের এই বাদানুবাদের কোন বাস্তব ভিত্তি নেই। কাসেম আমীন যা বলেছেন তা সম্পূর্ণরূপে মুসলিম নারীদের প্রকৃত অবস্থাকে নিরপেক্ষ ও খোলা মন নিয়ে পরীক্ষা-নীরিক্ষা করে দেখার সামান্যতম চেষ্টা ব্যতিরিকে এবং খৃস্টান মিশনারীদের সকল আক্রমণকে অন্ধভাবে গ্রহণের ফলেই হয়েছে। প্রকৃত সত্য কথা হল- এই অধঃপতনের যুগেও অধিকাংশ মুসলিম পরিবার থেকে পারস্পরিক ভালবাসা ও সহানুভূতির

দ্বীপ্তি বিকীর্ণ হচ্ছে। বিশ্বের সকল দেশের মধ্যে মুসলিম দেশগুলোতেই পারিবারিক বন্ধন মজবুত। এই ঐতিহ্যগত পারিবারিক বিন্যাসের ফলে মুসলিম নারীগণ পরিবারে মা ও বধূ হিসেবে প্রভূত সম্মান, শ্রদ্ধা ও মর্যাদা পাচ্ছেন। তারা তথাকথিত পুরুষ নিপীড়কের ভয়ে পর্দা পালন করছেন না; বরং এতে তার জন্য প্রচুর কল্যাণ নিহিত আছে জেনেই করছেন। এতে তাকে যে কিছু মানসিক চাপ সহ্য করতে হয় না, তা নয়। তবে সেটা নারীর সামাজিক অমর্যাদার কারণে নয়, বরং তা প্রচলিত নৈতিক অবক্ষয় ও বঞ্চনার কারণেই।

১৯৬১ সনের ১লা এপ্রিল আমাকে লেখা একটি ব্যক্তিগত পত্রে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী উল্লেখ করেন, "পাশ্চাত্য সভ্যতা নারী জাতির প্রতি খুবই নিষ্ঠুর প্রমাণিত হয়েছে। এই সভ্যতা নারীকে একদিকে প্রকৃতিগত নারীত্বের দায়িত্ব পালন করাচ্ছে, অন্যদিকে তাকে একই সাথে পুরুষের বহুবিধ কাজে অংশগ্রহণের জন্য ঘরের বাইরে নিয়ে এসেছে। এভাবে তারা নারীকে দু'টো শানপাথরের মাঝখানে চৌকোণাভাবে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। অধিকন্তু তাদের প্রচারণা নারী সমাজকে পুরুষদের কাছে নিজেকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রলুব্ধ করেছে। এই প্রতিযোগিতায় তারা স্বাভাবিক শালীনতাকে বিসর্জন দিয়ে অপর্যাপ্ত পোশাক, এমনকি নগ্নতা পর্যন্ত গড়িয়েছে। এভাবে তারা পুরুষের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছে। একমাত্র ইসলামই নারীকে এই দুর্গতি থেকে রক্ষা করতে পারে। কারণ, ইসলাম একজন নারীকে শুধুমাত্র একজন পুরুষের জন্যই নির্দিষ্ট করে দেয় এবং অন্য সকল পুরুষের হাত থেকে তাকে রক্ষা করে। এভাবে ইসলাম নারীকে তার প্রকৃতিগত কাজে নিরাপত্তা দিয়ে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা নারীকে অসংখ্য পুরুষের মনোরঞ্জনের জন্য সেবাদাসীতে পরিণত করেছে। এবং যে সকল কাজ সত্যিকারভাবে একজন রমনীর জন্য শোভনীয় সে সকল কাজের প্রতি তার হৃদয়ে একটি মিথ্যা লজ্জার ধারণা সৃষ্টি করে দিয়েছে। পরিবার ও সংসারকর্ম সংক্রান্ত ইসলামী নীতিমালাই একজন নারীর জন্য যথার্থভাবে উপযুক্ত এবং তার প্রকৃতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল।"

পাশ্চাত্য সভ্যতার জন্য অন্ধ আনুগত্যের ফলে ১৯০১ সনে কাসেম আমীন বুঝতেই পারেননি যে, পাশ্চাত্যের এই নারী মুক্তিবাদী প্রচারণা পরবর্তী প্রজন্মকে

ব্যাপকহারে অবাধ, সার্বজনীন ও অবৈধ যৌনতা চরিতার্থতার দিকে নিয়ে যাবে এবং তা মানুষের সহজাত পারিবারিক বন্ধনকে সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন করে দেবে।

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে কাসেম আমীন তার এই বইয়ের মাধ্যমে মুসলিম রমনীর পর্দার বিরুদ্ধে প্রচারণার যে তুফান তুলেছিলেন তার প্রতি খৃস্টান মিশনারী ও পশ্চিমা আধিপত্যবাদীদের সর্বাত্মক সমর্থনের ফলে তা মুসলিম সমাজের অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করে। এই প্রচারণার ফলে প্রত্যেক মুসলিম দেশে আগাছার মত একদল উচ্ছৃংখল মহিলা বেরিয়ে আসলো- যারা মুসলিম নারীর সঠিক দায়িত্বানুভূতিকে ধ্বংস করে দিয়ে তাদের জীবন পদ্ধতিকে পশ্চিমা নষ্ট মেয়েদের জীবন পদ্ধতির সাথে একাকার করে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

নারী স্বাধীনতা ও ইসলাম

আধুনিক বিশ্বে এমন কোন মুসলিম দেশই হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না, যে দেশ পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতাবাদীদের মারাত্মক প্রচারণার স্বীকার হয়নি এবং পর্দা প্রথাকে একটি প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় বিধানরূপে চিহ্নিত করেনি, কিংবা তথাকথিত নারী স্বাধীনতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির অপরিহার্য অংশ হিসেবে মেনে নেয়নি। যেমন- ১৯৭৬ সনের ১৯শে অক্টোবর পাকিস্তান টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডক্টর মুহাম্মদ মুকাদ্দাম বলেন, "কোন দেশকেই আধুনিকীকরণ করা সম্ভব নয় যদি না সে দেশের নারী সমাজকে ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন করা যায়। প্রাচ্যের অনেক দেশেই আধুনিকতার ছোঁয়া লাগতে দেরী হয়েছে নারী সমাজকে স্বাধীনতা দানের ব্যাপারে সে সকল দেশের জনগণের মাঝে প্রোথিত গোঁড়ামী ও আদিম বিশ্বাসের কারণেই। পৃথিবীর অপরাপর দেশের সাথে যদি তাল মিলিয়ে না চলতে পারি তাহলে আমরাও স্বাধীন জাতি হিসেবে টিকে থাকতে পারবো না। এশিয়া ও আফ্রিকার সকল উন্নয়নশীল দেশে নারী সমাজের ভূমিকা সুস্পষ্ট। দেশের উন্নয়নের জন্য তাদেরকে অবশ্যই সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সকল কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে হবে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখজনক ব্যাপার হলো দেশের কিছু সংখ্যক লোক বিষয়টি বুঝতেই চায় না।"

১৯৬৭ সনের আগস্ট মাসে পাকিস্তান জাতীয় সংহতি পরিষদের উদ্যোগে লাহোরে অনুষ্ঠিত "পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দু'দশকে নারী স্বাধীকার" শীর্ষক সেমিনারে উপরোক্ত বক্তব্যের ঠিক একই রূপ মন্তব্য করা হয়। যদি আমরা নিজেদেরকে মুসলিম বলে দাবী করি এবং আমাদের এই দেশ গঠনের আদর্শিক ভিত্তি ইসলাম বলে মনে করি তবে কি এটা জানা আমাদের জন্য কর্তব্য হয় না যে, ইসলাম নারী স্বাধীনতার ব্যাপারে আমাদের কি শিক্ষা দিয়েছে?

নারী অধিকার সম্পর্কে মত প্রকাশ করতে গিয়ে সূরা নিসার ৩৪নং আয়াতে বলা হয়েছে, "পুরুষরা হচ্ছে নারীদের তত্ত্বাবধায়ক। কারণ, আল্লাহ পুরুষদেরকে নারীদের চেয়ে বেশি যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং পুরুষরা নারীদের জন্য তাদের অর্থ ব্যয় করে।"

এ কথার তাৎপর্য হলো, কোন মুসলিম নারীই ততক্ষণ পর্যন্ত তার নিজের জীবিকা অর্জনে বাধ্য নয় যতক্ষণ পর্যন্ত তার জীবন ধারণের মত সামর্থ থাকবে, তার স্বামী মারা না যাবে কিংবা সে তালাকপ্রাপ্তা না হবে অথবা তার ভরণপোষণ দেয়ার মত কোন পুরুষ আত্মীয় থাকবে।

কোরআনের শিক্ষা অনুযায়ী স্বামী তার স্ত্রীর জন্য বন্ধু ও কর্তা। স্বামীর কর্তব্য হলো স্ত্রীর প্রতি ন্যায়নিষ্ঠা, ভালবাসা ও দয়া প্রদর্শন করা এবং এর প্রতিদানে স্ত্রীর দায়িত্ব হলো স্বামীর প্রতি বাধ্য ও অনুগত থাকা এবং স্বামী যাতে চরিত্রহীন হতে না পারে সে জন্য তার প্রতি অকৃত্রিম আস্থা নিবেদন করা।

কোরআনে স্বামীকে স্ত্রীর চেয়ে একমাত্রা ওপরে স্থান দেয়া হয়েছে এ জন্য নয় যে, সে নির্মম অত্যাচারী হবে, বরং তার দ্বারা পারিবারিক সুরক্ষা প্রতিষ্ঠিত হবে সে জন্যেই। যে পরিবারের স্ত্রী আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর সে পরিবারে স্বামী স্বাভাবিকভাবেই পরিবারের কর্তৃত্বের ভূমিকা হারায়। পক্ষান্তরে পরিবারে মায়ের কর্তৃত্ব বেড়ে গেলে পিতার প্রতি সন্তানদের শ্রদ্ধাশীলতা হ্রাস পায়।

সূরা আন-নূরের ৩০-৩১ নং আয়াতে মুসলমান পুরুষদেরকে গায়ের মুহাররাম নারীদের প্রতি এবং মুসলিম নারীদেরকে গায়ের মুহাররাম পুরুষদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। পুরুষ ও নারী উভয়কেই বলা হয়েছে পরস্পরের চক্ষুকে অবনমিত রাখতে। মেয়ে লোকদেরকে মাথায় চাঁদর পরতে বলা হয়েছে এবং তার আঁচল দিয়ে মুখমন্ডল ও বক্ষদেশ ঢেকে রাখতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাদেরকে তাদের স্বামী ও বিবাহ নিষিদ্ধ নিকটাত্মীয়দের ছাড়া আর কারো সামনে নিজেদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রয়োগিকভাবে এই আয়াত দ্বারা মুখমন্ডলে কসমেটিক্স লাগানো এবং যৌন আবেদন সৃষ্টি করে এমন সব পোশাক পরিধান নিষিদ্ধ হয়েছে।

হাদীস থেকে জানা যায়, রসূল (স)-এঁর স্ত্রী হযরত আয়েশা (রা)-এঁর ছোট বোন হযরত আসমা (রা) একদিন পাতলা কাপড়ের পোশাক পরে রসূল (স)-এঁর সামনে আসলে মহানবী তাঁকে এই বলে তিরষ্কার করেছিলেন যে, যখন কোন মেয়েলোক বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন থেকে তার মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় ছাড়া কোন কিছুই প্রকাশ করা উচিত নয়। সূরা আল আহযাবের ৫৫ নং আয়াতে মহান আল্লাহ নবী (স)-এঁর স্ত্রীদের ঘরে গায়ের মুহাররাম পুরুষ ও বেগানা

মহিলাদেরকে প্রবেশ করতে নিষেধ করেছেন এবং ৫৯ নং আয়াতে মুসলিম নারীদেরকে আকর্ষণীয় পোশাক ও অলংকারাদি পরে বাইরে বের হতে বারণ করা হয়েছে এবং জনসম্মুখে পোশাক ও আচরণে এমন কিছু প্রদর্শন করতে মানা করা হয়েছে যাতে তাদের প্রতি মানুষের আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে।

স্ত্রীলোকেরা পরিবারের মুহাররামা পুরুষ, চাকর ও দাসদের সাথেই কেবল খোলামেলা কথাবার্তা বলতে পারবে।

সূরা আহযাবের ৫৩ নং আয়াতে বিশ্বাসীগণকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে রসূল (স)-এঁর স্ত্রীদেরকে যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের এবং তাঁদের নিকট কিছু চাইতে হলে তা পর্দার বাহির থেকে চাইতে। ৫৯ নং আয়াতে যখন কোন কারণে কোন মুসলিম মহিলাকে ঘরের বাইরে যেতে হয় তখন তাকে তার পুরো দেহ একটি চাঁদর দিয়ে ঢেকে নিতে বলা হয়েছে, যাতে করে তাদেরকে ধার্মিক মহিলা হিসেবে চেনা যায় এবং যাতে তারা উত্যক্ত না হয়। কোরআন মহানবী (স)-এঁর স্ত্রীদেরকে এবং প্রায়োগিকভাবে সকল মুসলিম মহিলাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে যখন কোন জরুরী প্রয়োজনে কোন গায়ের মুহাররাম পুরুষের সাথে সাক্ষাত করতে হয় তখন যেন সে তার সাথে এমন আবেগময় ভংগি ব্যবহার না করে যাতে লোকটির মনে প্রেমভাব উৎপন্ন হতে পারে। বরং কথাবার্তা যেন সাদামাটা ও প্রথাগত হয়। হাদীসে মুসলিম নারীদেরকে স্বামী ও বিবাহ নিষিদ্ধ নিকটাত্মীয়দের ছাড়া অন্য কারো সাথে (অর্থাৎ মুহাররাম কোন পুরুষের পরিচালনা ব্যতিরেকে) একাকী দূর যাত্রায় বের হতে নিষেধ করা হয়েছে।

যেখানে অধিকাংশ সহীহ হাদীসে মুসলিম নারীদেরকে মসজিদে নামাজের জামায়াতে একত্রিত হতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে এবং গৃহের নিভৃত কোণে নামাজ আদায় করাকেই খোদার কাছে অধিক পছন্দনীয় বলে বর্ণনা করা হয়েছে; সেখানে একজন মুসলিম মহিলার প্রাইভেট সেক্রেটারী, ব্যাংক ক্লার্ক, বিমানবালা, হোটেল পরিচারিকা, বিজ্ঞাপন মডেল, গায়িকা, ড্যান্সার এবং সিনেমা, টেলিভিশন ও রেডিওতে অভিনেত্রীর ভূমিকায় আসাকে কিভাবে বরদাস্ত করা যেতে পারে?

সূরা আন-নূরের ১-২৪ নং আয়াতে যারা বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্ক রাখে তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি প্রদানের ভয় দেখানো হয়েছে।

ইসলামে এ ব্যাপারে কোন দ্বৈত-মাপকাঠির ব্যবস্থা নেই। যারা অবৈধ যৌন সম্পর্ক রাখে সে সকল নারী ও পুরুষের শাস্তির মধ্যে কোরআন ও হাদীসে কোন পার্থক্য করা হয়নি। উভয়ের জন্যই একই রূপ কঠিন শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। কোরআন ও হাদীসের এই প্রমাণ ছাড়া পর্দার সপক্ষে ইসলামের অধিক আর কি প্রমাণ দরকার হতে পারে? মুসলিম মহিলাদের চলাফেরার ক্ষেত্রে এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র নারীদের প্রতিরক্ষা এবং পুরুষদেরকে তাদের প্রতি অশুভ পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে সংযত রাখার উদ্দেশ্যেই আরোপিত হয়েছে। পৃথিবীতে ইসলামই হলো একমাত্র ধর্ম যা শুধু অনৈতিকতাকে মন্দ বলেই ক্ষান্ত হয় না বরং অনৈতিকতাকে উদ্দীপ্ত করে এমন যে কোন সামাজিক কর্ম থেকে বিশ্ববাসীদেরকে ফিরে থাকতে আদেশ দেয়।

নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম প্রবক্তা হচ্ছেন সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা মার্কস্ ও এঙ্গেলস। ১৮৪৮ সনে প্রকাশিত তাদের কমিউনিস্ট মেনিফেস্টো বইয়ে তারা লিখেন, "গৃহ ও পরিবার একটি অভিশাপ ছাড়া কিছুই নয়। কারণ, এটি নারীদেরকে চিরস্থায়ীভাবে দাসত্বের শৃংখলে আবদ্ধ করে রাখে।" তারা বলেন, "নারীদেরকে পারিবারিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে দিতে হবে এবং কল-কারখানায় সার্বক্ষণিক কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাদেরকে পুরোপুরি অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা অর্জনের সুযোগ দিতে হবে।" তাদের পরবর্তী নারীবাদী প্রবক্তারা সহশিক্ষা, ঘরের বাইরের একই কর্মস্থলে সহকর্মাবস্থান, সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে নারী-পুরুষের একত্র মিলন, অর্ধনগ্ন পোশাকে বিবাহপূর্ব প্রেম-অভিসার এবং যৌথ সামাজিক অনুষ্ঠানাদিতে মদ্যপান, নেশাপান ও নৃত্যগানের মাধ্যমে নারী-পুরুষের অবাধ যৌনাচারের সুযোগদানের জন্য জিদ ধরেন। এ ক্ষেত্রে তারা সরকারি ব্যবস্থাপনায় জন্মরোধক সামগ্রী, বন্ধাকরণ ব্যবস্থা, অবাঞ্ছিত গর্ভের বিমোচন, অবৈধ সন্তানদের লালন পালনের জন্য রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত নার্সারী ও বোর্ডিং-এর ব্যবস্থা রাখার দাবী করেন। এটাই হচ্ছে আধুনিক "নারী অধিকার" তত্ত্বের মূলগত ধারণা।

লাহোরের গুলবার্গ গার্হস্থ অর্থনীতি বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক সেমিনারে তেহরান ইউনিভারসিটির ভাইস চ্যান্সেলর শ্রোতাদেরকে এ কথা বুঝাতে চেষ্টা করেন যে, "আধুনিক সভ্যতার সাথে যেটুকু খারাবী যোগ হয়েছে তা অতি উদ্বিগ্ন

রক্ষণধর্মী প্রতিক্রিয়াশীলদের ধারণার চেয়ে অনেক কম।" কিন্তু এই ভীতির কারণগুলো কি কারো অজানা রয়েছে? দেখুন না, নারী স্বাধীনতার কি ফল পশ্চিমারা ভোগ করছে।

আমেরিকান এক ঐতিহাসিক ও কলামিষ্ট ম্যাক্সলার্নার বলেন, "আমরা একটি বেবিলিনীয় সমাজে বাস করছি। ইন্দ্রীয় সেবার প্রতি গুরুত্বারোপ ও যৌন স্বাধীনতার ফলে সমাজের সকল পুরাতন নীতি-নৈতিকতার বন্ধন ভেঙে গেছে।" কিছুদিন আগেও কী জনসম্মুখে প্রকাশ করা যাবে কিংবা যাবে না তা নির্ধারণ করতো চার্চ, রাষ্ট্র, পরিবার ও সম্প্রদায়। কিন্তু অধুনা এ সকল প্রতিষ্ঠানগুলো জনসাধারণের দাবীর কাছে পরাজিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানগুলোর এখন দায়িত্ব দাঁড়িয়েছে শুধুমাত্র শোনা ও দেখা। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র দর্শকরা প্রতিদিন আর্ট গ্যালারী ও নাট্য গৃহসমূহে একত্রিত হচ্ছে উলঙ্গপ্রায় সুইডিস নায়িকার 'আমি এক নারী' সিরিজের পর্ণ নাচ গান দেখে যৌন উত্তেজনা প্রবল করার জন্য। ইটালীয় সিনেমা পরিচালক ম্যাকিল্যানজেলো এন্টোনিওনি তার 'ভেঙে দাও' ছায়াচিত্রে নগ্নতা বিরোধী সকল ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞার মাথা খেয়েছেন। ফরাসী কৌতুক প্রিয় নায়িকা জেনফন্ডা সীমাহীন প্রলোভনধর্মী ছায়াছবি বারবারেলায় মুক্ত প্রেমাভিসারের গুণ কীর্তন করতে করতে একটি নগ্নতার দৃশ্য থেকে পরবর্তী অধিকতর আর একটি নগ্নতার দৃশ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেন। কমপক্ষে দু'ঘণ্টা স্থায়ী 'জেসনের প্রতিকৃতি' নামক ছায়াচিত্রে একজন নিগ্রো বেশ্যা পুরুষের বিকৃত আত্মার ভ্রমণ কাহিনী এখন আমেরিকার প্রায় সকল স্বাধীন প্রেক্ষাগৃহগুলোতেই খোলাখুলিভাবে দেখানো হয়ে থাকে, যা মানব জীবনের পবিত্রতার দিকগুলোকে সংকুচিত করছে। খৃষ্টীয় ধর্মতত্ত্ববিদ ফাদার ওল্টার জে. ওং বলেন, "আমরা শীঘ্রই জানা অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিক মাত্রায় স্বাধীন জীবন যাপনের সুযোগ পাচ্ছি.....।" (রিডার্স ডাইজেস্টের ১৯৬৮ সালের এপ্রিল সংখ্যায় প্রকাশিত "সমাজ যেদিকে যাচ্ছে আমাদের সব কিছু সেদিকে যাচ্ছে" নামক নিবন্ধ থেকে)।

আসুন পাশ্চাত্যের এই সামাজিক অবক্ষয়ের কী প্রভাব মুসলিম দেশগুলোর ওপর পড়েছে তা দেখা যাক। নারী স্বাধীনতা ও নৈতিক অধঃপতনের একটি প্রধান ও কার্যকর মাধ্যম হলো সিনেমা। "লাহোরের হিরামন্ডি জেলার প্রতিটি মেয়েরই আকাংখা হচ্ছে অভিনেত্রী হওয়া। তারা সকলেই চাচ্ছে চিত্রনায়িকা

হতে। এই ইচ্ছার বাস্তবায়নের জন্য তারা যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে রাজী আছে। এদের একটি বিরাট সংখ্যক মেয়ে তাদের নায়িকা হওয়ার আকাংখা পূরণের শর্তে তথাকথিত সিনেমা পরিচালক ও প্রযোজকদের খুশী করার জন্য যে কোন জায়গায় উপস্থিত হতে রাজী রয়েছে। সিনেমা শিল্পের দ্বারা খুব সহজে ও সাধারণভাবে বিভ্রান্ত মেয়েলোক এরাই। এদের অধিকাংশই টুকিটাকি কিছু অভিনয়ের সুযোগ পেলেই খুশী। অতিরিক্ত বেশ কিছু মেয়ে এভাবেই সিনেমার সাথে সংশ্লিষ্ট হয়। এদের মধ্যে সামান্য কয়েকজন অবশ্যি প্রতিষ্ঠাও পায়। শহরের অনেক হোটেলই "শুভ সময়" এর কাজে ব্যবহৃত হয়। কতিপয় হোটেল পরিচালক থাকে কোটনার ভূমিকায়। অধিকাংশ রেস্তোরাঁ ব্যবহৃত হয় খদ্দেরের সাথে নষ্টা মেয়েদের সাক্ষাতের স্থান হিসেবে। এ সকল মেয়ে লোকদেরকে নগরীর বাস স্ট্যান্ডগুলোতেও দেখা যায়। শহরের প্রেক্ষাগৃহগুলোও খদ্দের ধরার জন্য খুবই পরিচিত স্থান। প্রেক্ষাগৃহগুলো যে শুধু সিনেমা দেখা ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহৃত হয় না তাও নয়। এ সকল ক্ষেত্রে পুলিশের ভূমিকা খুবই শিথিল।" (১৯৬৮ সালের ২৯ ও ৩০শে মার্চ তারিখে 'দি পাকিস্তান টাইমস'-এ প্রকাশিত 'লাহোরে বেশ্যাবৃত্তি' নামক প্রতিবেদন থেকে)।

ক্রিস্টাইন কীলার অথবা মেরিলিন মনরোর মত মহিলা সেনাবাহিনী গঠন করা কি আমাদের জাতীয় উন্নয়নের অংশ হতে পারে?

নারী স্বাধীনতার পক্ষে পত্র-পত্রিকা, রেডিও এবং সিনেমার প্ররোচনা স্ত্রী ও সন্তানের মা হিসেবে নারীর ভূমিকাকে তাচ্ছিল্য ও খাটো করছে। সন্তানের লালন-পালনের জন্য নারীদের গৃহে অবস্থানকে এই প্রচারণা জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অর্ধেক জনশক্তির অনুপস্থিতির ফলে অমার্জনীয় ক্ষতির কারণ বলে বর্ণনা করছে।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে মুসলিম দেশসমূহে সহশিক্ষার দ্রুত প্রসারের ফলে ছেলে মেয়েদের মধ্যে অবাধ মেলামেলা ও যৌন অপরাধ প্রবণতা এমনভাবে বেড়েছে যে, তা অজস্র যুবক-যুবতীকে ধ্বংসের মুখোমুখি করে দিয়েছে এবং বিস্তার ঘটিয়েছে অসংখ্য পাপ কর্মের। সহশিক্ষা এই ভ্রমাত্মক ধারণার ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, নারী ও পুরুষের মধ্যে জন্মগত কোন পার্থক্য নেই, সুতরাং উভয়কেই একই কর্মক্ষেত্রে অভিন্ন কাজের জন্য নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। ফলতঃ যে সকল মেয়ে সহ-শিক্ষা গ্রহণ করে তারা খুবই খারাপভাবে নিজেদেরকে বিবাহ ও

মাতৃত্বের জন্য প্রস্তুত করে। এরপরও নারী স্বাধীনতাবাদীরা বলে থাকেন মেয়েদের প্রাথমিক দায়িত্ব স্বামীর গৃহেই। এ কথার অন্য অর্থ দাঁড়ায়, আধুনিক নারীদেরকে দ্বৈত দায়িত্ব পালন করতে হবে। নিজের জীবিকার জন্য সারাক্ষণ ঘরের বাইরে কাজ করার পরও ঘরে ফিরে তাকে সন্তানের লালন-পালন, ঘরদোর সাজানো ও স্বামীর প্রয়োজন পূরণের মত অসম্ভব প্রায় সব বাধ্যবাধকতা পালন করতে হবে। এটাও কি ন্যায় বিচার?

মুসলিম দেশসমূহে অধুনা পাশ্চাত্যের আইনের অনুরূপ যে পারিবারিক আইন পাস করা হয়েছে, সে আইন কি বাস্তবিকভাবে আমাদের নারী সমাজের কোন উন্নয়ন ঘটিয়েছে? এই আইন সতর্কভাবে বিবাহের জন্য একটি বয়সসীমা নির্দিষ্ট করে দেয় বটে, কিন্তু এই বয়স সীমার নীচে (বিবাহ নিষিদ্ধ বয়সে) ছেলে-মেয়েদের অবৈধ যৌন কর্মের ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা জারী করার বিষয়টি বেমালুম ভুলে যায়।

অধিকাংশ মুসলিম দেশে আধুনিকতাবাদীরা কোরআন ও সুন্নাহর আইন লংঘন করে বহুবিবাহ প্রথাকে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, এমনকি নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করেছে। তারা কখনোই এই মানসিক অবস্থাটা বুঝতে চাচ্ছেন না যে, একজন স্ত্রীর পক্ষে তার স্বামীর অন্য একজন স্ত্রী যিনি তার নিরাপত্তাধীনে রয়েছেন এবং তার সন্তানেরা পিতার ভালবাসা ও যত্ন পাচ্ছেন তার সাথে স্বামীর ভালবাসাকে ভাগাভাগি করে নেয়া ভাল, না দেশীয় আইনে বর্তমান স্ত্রীকে তালাক না দিয়ে এবং তার সন্তানদেরসহ তাকে তাড়িয়ে না দিয়ে অন্য কোন স্ত্রী গ্রহণে বাধা আছে বলে গোপনে কোন মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্ক রেখে চলছে তা দেখা ভাল?

এটা কি সেই মহিলার জন্য কল্যাণকর নয়, যে তার স্বামীর সাথে ভালোভাবে থাকতে পারছে না, তাকে তার স্বামী ব্যক্তিগতভাবে তালাক দিয়ে দিবেন এবং এই দম্পত্তি শান্তিপূর্ণভাবে পৃথক হয়ে গিয়ে আবার নতুন করে পছন্দমত বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবেন? না, সেইটা ভাল যে, তাদের বিষয়টি কোর্টে যাবে এবং স্বামী এই বিবাহ বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য কোর্ট নির্ধারিত ডিভোর্সের "প্রয়োজনীয় শর্ত" পুরণার্থে বাধ্য হয়ে স্ত্রীর ওপর অনৈতিক আচরণ ও পাগলামীর মিথ্যা দোষারোপ করবে, যা মহিলাটির জন্য সামাজিক কলংক

হয়ে দাঁড়াবে এবং বেচারিণীর সকল সুনাম সুখ্যাতি জীবনের তরে ধুলিস্বাৎ করে দেবে?

প্রকৃতপক্ষে নারী স্বাধীনতাবাদের প্রবক্তারা নারীর ব্যক্তিগত সুখ সুবিধার প্রতি আগ্রহশীল নয়। লাহোরে 'নিখিল পাকিস্তান মহিলা পরিষদ' আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে পরিষদের এক সক্রিয় সমর্থক জনাবা সাতনাম মাহমুদ তার বক্তব্যে সরলতার সাথে এ কথা স্বীকার করেন যে, যদিও পাশ্চাত্যের মহিলারা বস্তুগত প্রাচুর্য এবং সামাজিক পূর্ণ স্বাধীনতা ও সম-অধিকার ভোগ করছে, তথাপি তারা কাংখিত সুখে সুখী নয়। তিনি বলেন, যদি আত্মীক সুখই লক্ষ্য হয় তবে তার সমাধান তথাকথিত নারী স্বাধীনতার মধ্যে পাওয়া যাবে না। সুবিধাবাদী সমাজকর্মী এবং উক্ত মহিলা পরিষদের অন্যতম সদস্যা বেগম কাইসেরা আনোয়ার আলী তার বক্তব্যে যে সকল উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা নিজ ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতীয় ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ তাদের বিষয়ে এমনভাবে নৈরাশ্য প্রকাশ করেন যে, তাদের সংগঠন মেয়েদের এই উন্নাসিকতার যে সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক তা যেন তিনি জানেনেই না।

"সকল মুসলিম দেশেই নারী স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে"- এ প্রচারণার আসল উদ্দেশ্য কি? এটা আসলে একটি মারাত্মক ষড়যন্ত্র যা আমাদের সংসার, পরিবার এবং এমনকি গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে চায়। 'নারী অধিকার', 'নারী স্বাধীনতা' ও 'নারী উন্নয়ন' প্রভৃতি সস্তা শ্লোগান শুধুমাত্র মূল উদ্দেশ্যকে কুহেলিকার আবরণে ঢেকে রাখার জন্যেই।

মুসলিম বিশ্বে নারী মুক্তি আন্দোলন সেই চরম পরিণতিই ডেকে আনবে যা বিশ্বের অন্যান্য স্থানে এখন ঘটছে। যৌন বিষয়ে বিশ্বব্যাপী আজকের মানব সম্প্রদায় যে হারে ন্যাক্কারজনক আচরণে লিপ্ত হয়েছে তা বন্য পশুদের বিবেককেও হার মানায়। এই আচরণের অনিবার্য পরিণতিতে সংসার ও পরিবার পদ্ধতিসহ সামাজিক সকল নৈতিকতার বন্ধন সম্পূর্ণরূপে ভেঙে পড়বে এবং ব্যাপকভাবে বিশ্বের অপরাধ, দুর্নীতি, নির্যাতন, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং আইনের কার্যকরীহীনতা দেখা দিবে। অতীতের সকল ইতিহাসই এর যথার্থ সাক্ষী যে, যখনই কোন সমাজে পাপ ও অনৈতিকতার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে সে সমাজ আর বেশী দিন টিকে থাকতে পারেনি।

নারী সমবাদী আন্দোলন ও মুসলিম নারী

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী একটি মৌলিক আন্দোলন যা গোটা সামাজিক কাঠামোর বিবর্তন এবং সকল মানবিক সম্পর্কের পরিবর্তন দাবী করছে, তা হচ্ছে নারী সমবাদী আন্দোলন। "নারী মুক্তি আন্দোলন" নামেই এটি অধিক পরিচিত।

"নারী মুক্তি আন্দোলন" বর্তমান যুগের কোন একক সৃষ্টি নয়। এর ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট প্রাচীনকাল পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে। প্লেটো তার "দি রিপাবলিক" গ্রন্থে পারিবারিক জীবন ও নারী পুরুষের দ্বারা চিহ্নিত সামাজিক সম্পর্কের অবসান দাবী করেছেন। প্রাচীন মিলনাত্মক নাটক লাইসিস্ট্রাটা এবং বিগত শতাব্দীতে হেনরিক ইবসেন্সের (১৮২৮-১৯০৬) লেখা "পুতুলের ঘর" নাটো এই নারীবাদী ধারণার পৌরহিত্য করা হয়েছে। ভিকটোরিয়ান যুগের অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক জন স্টুয়ার্ড মিল এবং সমাজবাদী দার্শনিক ফ্রেডারিক এঞ্জেলস ১৮৬৯ সনে লেখা "নারী পরাধীনতা" (Subjection of women) নামক প্রবন্ধে নারী মুক্তিবাদের তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করেন। ১৮৮৪ সালে এঞ্জেলস জন সমক্ষে ঘোষণা করেন যে, "বিবাহ হচ্ছে এক ধরনের নিরানন্দ দাসত্ব বরণ"। বিবাহ প্রথার উচ্ছেদ করে তিনি সরকারী ব্যবস্থাপনায় সন্তান লালন পালনের পরামর্শ দেন।

আমেরিকায় "নারী স্বাধীনতা" আন্দোলন শুরু হয়েছিল দাস প্রথার বিলোপ ও মাদক বিরোধী আন্দোলনের বাড়তি অংশ হিসেবে। যে সকল মহিলা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা দেখলেন যে, তাদের দাবী জোরালো করতে হলে তাদের রাজনৈতিক শক্তি দরকার। ১৮৪৮ সনের সেনেকাফলস্ কনভেনশন (Seneca Falls Convention) এই "নারী মুক্তি আন্দোলনের" পথিকৃত। এই কনভেনশনের ঘোষণাপত্রে মহিলাদের নিজ সম্পত্তি ও উপার্জনের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব, স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে ডিভোর্স করার ক্ষমতা, সন্তানদের ওপর মায়ের অভিভাবকত্ব, চাকুরী ক্ষেত্রে নারী পুরুষের ভেদাভেদ দূরীকরণ পূর্বক একই কাজে সম বেতন-ভাতা নির্ধারণ এবং নির্বাচনে মহিলাদের ভোটাধিকারসহ প্রতিনিধিত্বের দাবী করা হয়।

মহিলা ভোটাধিকারের প্রচারণা যখন শুরু হল অধিকতর রক্ষণশীল নারীবাদীরা তখন তাদের সকল কর্ম প্রচেষ্টা শুধু এই একটি ইস্যুতে নিবদ্ধ করলেন। ১৯২০ সালে মার্কিন সংবিধানের যখন ১৯তম সংশোধনী আনা হল তখন দেখা গেল মহিলা কর্মীরা এবং জনগণ যা ধারণা করেছিলেন অর্থাৎ নির্বাচনে মহিলাদের ভোটাধিকার, তা পুরাপুরি এই সংবিধানে মেনে নেয়া হয়েছে। এরপর থেকে চল্লিশ বছরেরও অধিককাল নারীবাদী আন্দোলন অন্তর্হিত ছিল।

১৯৬১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট এফ, কেনেডি মহিলাদের সামাজিক মর্যাদা সংক্রান্ত একটি প্রেসিডেন্টস কমিশন গঠন বিষয়ে প্রশাসনিক আদেশে স্বাক্ষর প্রদান করেন এই আদেশের বিষয়বস্তু ছিল, যে সকল প্রচিলত ধারণা, প্রথা, রীতি-নীতি, "নারী অধিকার" বাস্তবায়নে বাঁধা দেয় সেগুলো চিহ্নিত করা এবং তার প্রতিকারের সুপারিশ করা। এই প্রেসিডেন্টস কমিশন গঠনই হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মহিলাদের অবস্থান নির্ধারণ সম্পর্কিত প্রথম সরকারী পদক্ষেপ। এভাবে ১৯৬০ এর দশকের প্রথম ভাগেই সভা, সমাবেশ, মিছিল ও প্রতিরোধ কর্মসূচীর মাধ্যমে ৫০ বছরের সুপ্ত নারীবাদী আন্দোলন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো এবং কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা এ সকল রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে শুরু করলো। ১৮৪৮ সালে সেনেকাফলস্ কনভেনশনে উপস্থিত মহিলারাতো শুধু মাতাল স্বামীদের দ্বারা গালি গালাজ ও দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ এবং বিবাহে নারীর আইনগত অধিকার, সম্পত্তি সংরক্ষণ, রোজগারের অধিকার ও একই কাজে মহিলা পুরুষের সম-বেতন দাবী করেছিলেন। কিন্তু তাদের এই উত্তরাধিকারীনীরা ছিলেন তাদের চেয়ে অনেক বেশী চরমপন্থী।

ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এবং দৃষ্টি আকর্ষণী নারী সাম্যবাদী বিক্ষোভ সমাবেশ হয় ১৯৭০ এর ২৬শে আগস্ট। এই দিন হাজার হাজার মহিলা প্লাকার্ড বহন করে নিউ ইয়র্কের ফিফথ্ এভিনিউতে সমবেত হন। এ সকল প্লাকার্ডে লেখা ছিল ঃ "গৃহ বধুরা বিনা মাহিনায় দাসী মাত্র", "গৃহ কর্মের জন্য সরকারী ভাতা চাই", "নির্যাতিতা নারী, ভাত রেধো না, স্বামীকে সারারাত উপোস রাখ", "মানবিক সহানুভূতি ভুলে যাও", "বিবাহে জড়িয়ো না", "তোয়ালে ধোয়া

মহিলাদের কাজ নয়", "গর্ভমোচন বৈধ কর", "অধীনতা সুস্থ জীবনের জন্য কাম্য নয়" ইত্যাদি।

বর্তমান সময়ের নারীবাদীরা লিংগের ভিন্নতা দ্বারা নির্ধারিত যে কোন সামাজিক কর্মকান্ডের ঘোর বিরোধী। তারা পুরুষের সাথে নারীর নিরংকুশ ও শর্তহীন সমতা দাবী করছেন, এমনকি তা দেহের গঠনগত বিষয়েও। নারী ও পুরুষের মধ্যে সৃষ্টিগত কোন পার্থক্য থাকতে পারে নারীবাদীরা তা স্বীকার করেন না। তাই স্ত্রীকে ঘরণী ও সন্তানের মা হতে হবে এবং স্বামী হবেন উপার্জনকারী ও গৃহকর্তা তা তারা মানতে রাজী নন। তারা বিশ্বাস করেন- নারীকেও পুরুষের মত যৌন কার্যে সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে, নিষ্ক্রীয় হলে চলবে না। তারা এ জন্য বিবাহ পদ্ধতি, সংসার ও পরিবার প্রথার বিলোপ এবং সরকারী ব্যবস্থাপনায় সন্তান লালন পালনের ব্যবস্থা প্রবর্তনের মাধ্যমে নারী জাতির পূর্ণ যৌন স্বাধীনতা দাবী করেন। তারা সকল নারীকে যৌন জীবনের ওপর পূর্ণ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জোর দেন। এ জন্য তারা জন্ম নিরোধক সকল সামগ্রীর ওপর সরকারী নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার দাবী করেন, যাতে এ সকল সামগ্রী বিক্রয়ের জন্য বিজ্ঞাপন প্রচারিত হতে পারে এবং বিবাহিত অবিবাহিত সকল বয়সের সকল মেয়েরা ডাক্তারী ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই যে কোন ঔষধের দোকান থেকে তা ক্রয় করতে পারে। তারা দাবী করেন, গর্ভপাত সংক্রান্ত সকল বাধা নিষেধ তুলে দিতে হবে এবং যে কোন বয়সের গর্ভবিমোচনে নারীকে পূর্ণ অধিকার দিতে হবে। শুধু প্রয়োজনে গর্ভপাতের সুযোগ থাকলেই চলবে না বরং গরীব মহিলারা যাতে ইচ্ছা করলেই গর্ভপাত করতে পারে, সে জন্য সরকারী ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে গর্ভপাতের ব্যবস্থা করতে হবে। স্কুলগুলোতে সকল বিষয়ে সহশিক্ষা প্রবর্তন করতে হবে। গার্হস্থ্ অর্থনীতি শুধু মেয়েদের জন্য এবং বিপণন ও কারিগরী শিক্ষা শুধু ছেলেদের জন্য নির্ধারিত থাকবে তা হবে না। ব্যায়ামাগার গুলোতে এবং শারীরিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলে মেয়েদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা তুলে দিতে হবে। মেয়েদেরকে সকল বয়সের ছেলেদের সাথে খেলাধুলা ও শরীর চর্চা প্রতিযোগীতা করার অনুমতি দিতে হবে। প্রচার মাধ্যম গুলোকে যৌনতার পার্থক্য সূচক সকল শব্দ পরিহার করে "কর্মে ও উৎপাদনে নারী-পুরুষ সমান" এ ধারণার সুনিপুন প্রচারণা চালাতে হবে। নারীবাদীরা শিশুতোষ পুস্তাকাদির সমালোচনা করেন এ জন্য যে, এগুলোতে একক মা কিংবা বাবার

পরিবারের উদাহরণ নেই এবং অবিবাহিতা ও স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নারীর মাতৃত্বকে আদর্শ হিসেবে দেখানো হয়নি। তারা বলেন, মেয়েদের খেলার জন্য দিতে হবে মেকানিক্যাল টয় এবং ছেলেদের জন্য যান্ত্রিক পুতুল। চরমপন্থী নারীবাদীরা বিবাহ, সংসার ও পরিবার সংক্রান্ত সকল প্রচলিত পদ্ধতি তুলে দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এলাকায় বসবাসরত সকল নারী পুরুষকে এক একটি বৃহৎ যৌন জোনে পরিণত করার প্রস্তাব দেন এবং সন্তানের লালন পালন সম্পূর্ণ সরকারী ব্যবস্থাপনাধীনে রাখার দাবী করেন। এ জন্য তারা আমেরিকায় যেমন প্রায় সকল এলাকায় জনগণের চিত্তবিনোদনের জন্য পার্ক, লাইব্রেরী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা গড়ে উঠেছে তেমনি সকল এলাকায় সরকারী ব্যবস্থাপনায় বিনামূল্যে শিশু যত্ন কেন্দ্র চালু করার দাবী করেন। তাদের দাবী হল স্ত্রীলোকদেরকে অর্থনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ স্বাধীন করে দিতে হবে এবং যে কোন পেশা গ্রহণে নারীত্ব কোন রূপ বাধা হতে পারবে না।

১৯৭১ সালে "দি নিউ ইয়র্ক টাইমস" পত্রিকায় প্রকাশিত "নারীবাদের পূণর্জন্ম" নামক এক প্রবন্ধে লিখিত হয় ঃ

"অনেক মহিলা বলতে পারেন যে, তারা সনাতন পন্থা অবলম্বন করতে চান। কিন্তু সেটা করা খুবই ভীতিজনক অথবা সেটা ভাবাই কঠিন বলে করতে পারছেন না। হ্যাঁ, পুরাতন নিয়মগুলোর মধ্যে একটা নিরাপদ ব্যবস্থা আছে বলে মনে হতে পারে। তবে সেটা তেমনি, যেমন কেউ জেলখানার মধ্যে কোন ক্ষমতা অর্জন করলো, আর তার কাছে মনে হল বাইরের জগতটা ভয়াবহ। সম্ভবত এ সকল মহিলা কোন্ বিষয়টি পছন্দ করবেন তা স্থির করতে পারছেন না, ভয় পাচ্ছেন। আমরা মহিলাদের ওপর কোন কিছু চাপিয়ে দিতে চাই না। আমরা চাই শুধু তাদের নিকট গ্রহণীয় হতে পারে এমন সব বিকল্প দিকগুলো তুলে ধরতে। আমরা খুঁজে বের করেছি এমন সব পছন্দনীয় জিনিস যা গ্রহণ করলে একজন মানুষ সত্যিকার মানুষ হতে পারে। আমরা চাই মানুষকে পূর্ণতা দিতে। কোন প্রথা, আইন বা মানসিক দাসত্বের দ্বারা তাদেরকে শৃংখলাবদ্ধ করতে চাই না। প্রকৃতিতে যদি এর জন্য স্থান না থাকে তবে প্রকৃতি এর জন্য স্থান করে দিতে বাধ্য।"

নারীবাদীরা মহিলাদের জন্য যে সকল "বিকল্প পছন্দ" খুঁজে বের করেছেন তার মধ্যে একটি হল নারী সমকামীতা (লেসবিয়ানিজম)। নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি শাখা হল সমকামী সংগঠন যা "দি ডটারস অব বিলিটিস" নামে পরিচিত। এর লক্ষ্য হল নারী সমকামীতার প্রসার ঘটানো।

"নারীবাদের পূণর্জন্ম" বইয়ের অন্যত্র বলা হয়েছে, "নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের অনেক সদস্যা রয়েছেন যারা এই আন্দোলন শুরু করার আগেই সমকামী ছিলেন এবং কিছু সদস্যা রয়েছেন যারা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের পর সমকামী হয়েছেন। পরে সমকামী হওয়াদের মধ্যে কতিপয় রয়েছেন যারা এটা বেছে নিয়েছেন রাজনৈতিক প্রতিবাদ হিসেবে। এই চরম নারীবাদীদের মতে "নারী সমকামীতা" পুরুষের অত্যাচার থেকে নারীর আত্মরক্ষার একটি মাধ্যম।"

নিউ ইয়র্ক থেকে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত নারী স্বাধীনতার উদ্দেশ্য সংক্রান্ত "দি নিউ ওম্যান" নামক একটি সংকলন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছেঃ "আমেরিকায় লেসবিয়ানরা সংখ্যালঘু, কিন্তু এই সংখ্যা এক কোটির কম নয়। লেসবিয়ান হচ্ছে সে সকল নারী যারা পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের প্রতি বেশী প্রেমাসক্ত হয়। সমকামিতা সম্পর্কে সম্ভবত সবচেয়ে বেশী যুক্তি প্রয়াশী এবং সবচেয়ে কম বাতিকগ্রস্ত মন্তব্য করেন দু'জন প্রখ্যাত মানসিক রোগের চিকিৎসক ডঃ জোয়েল ফোর্ট ও ডঃ জো, কে, অ্যাদামস। ১৯৬৬ সনে প্রকাশিত তাদের এই মন্তব্যটি হচ্ছে ঃ ভিন্ন কামীদের মত সমকামীরাও একই মানব গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত। কোন আইন বা কোন সামাজিক সংগঠক কিংবা চাকুরী দাতাদের দ্বারা এদেরকে একটি ভিন্ন মানব গোষ্ঠি হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে না। যৌন আচরণ সংক্রান্ত আইনের সংশোধন করতে হবে যাতে তা সমাজবিরোধী যুব আচরণ, বলাৎকার ও উৎপীড়ন ইত্যাদি নিয়ে কাজ করতে পারে। পারস্পরিক সম্মতিতে বয়স্কদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে সংঘটিত যে কোন যৌন আচরণকে রাষ্ট্রীয় কিংবা সরকারী হস্তক্ষেপ যোগ্য কোন বিষয় হিসেবে গণ্য করা চলবে না।"

বিবর্তনকারী এই নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিণতি কি এবং কি ধরনের সমাজ ব্যবস্থা তারা চাচ্ছেন তা এখন ভেবে দেখুন।

একই পুস্তকের ১২২-১২৫ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে ঃ "এভাবে পুরুষের কাছে নারী- যেমন দেবতার কাছে উপাসক। দেবতা উপাসকের পূজা গ্রহণ করতে পারে, তাকে নিজের কাজে লাগাতে পারে, কিন্তু তাকে আপন করে নিবে না, বরং তাকে পারে পায়ে ঠেলে দিতে। দেবতা ও উপাসক কখনো এক হতে পারে না। যৌন জীবন সম্পর্কে আমাদের সামাজিক শিক্ষা হল যৌবন উন্মেষের প্রথম দশ বছর কঠোর সংযম অবলম্বন করতে হবে (এমন কি হস্ত মৈথুনকেও এ ক্ষেত্রে বড় জোর একটি অপারগকতা গোছের অপরাধ বলে গণ্য করা হয়)। এরপর সারাজীবন শুধু একজনকেই যৌনসংগীনী হিসেবে ধরে রাখতে হবে। প্রকৃতপক্ষে সমাজ আমাদেরকে একটি উন্নত যৌন জীবন সম্পর্কে অজ্ঞ এবং সন্ধিঘ্ন করে রাখার চেষ্টা করছে এবং বুঝাতে চাচ্ছে যে, পাঁচমিশালী যৌনতার নিষিদ্ধ ফল নৈতিকতা সম্পন্ন ব্যক্তিরা যা পাচ্ছেন তার চেয়ে কখনও ভাল হতে পারে না। প্রচলিত মতবাদের কি এক বাধা! যদি আমরা এই বাধাকে অতিক্রম করে আমাদের সমকামী মনোবৃত্তি ও কৌতুহল চরিতার্থ করে দেখতে পারি, তবেই আমরা বিচার করতে পারবো যে, আমাদের আবেগটি কতটুকু নৈতিক বা অনৈতিক এবং তখনই সম্ভব হবে তার আপাত ফলাফল, গুণাগুণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধীরে ধীরে পরিচিতি লাভ করে তার প্রতিকারের কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া। যদি পুরুষ তার পুরুষত্বকে অস্বীকার করে এবং একত্ব, বিনয়, পারস্পরিক আলোচনা, বিবেচনা, সহযোগিতা, ভদ্রতাপূর্ণ অস্বীকৃতি ও বিরোধের সকল মূল্যবোধকে মেনে নেয় তখন কি ঘটবে? আমরা যেমন যৌনতা সম্পর্কিত আমাদের কল্পনার উৎকর্ষতাকে অস্বীকার করতে পারি না, তেমনি আমাদের সম্পর্কের সকল স্বাভাবিক যৌন উপাদানকেও অস্বীকার করা যায় না। এই যৌন সম্পর্ক যেভাবে ঘটে, অর্থাৎ আলাপচারিতা, স্পর্শ, অংগভংগি ও প্রেম নিবেদন ইত্যাদিকে রক্ষণশীলদের নৈতিক পবিত্রতার ধরন থেকে পৃথক করে আমাদের নির্দোষ পছন্দের ওপর ছেড়ে দিতে হবে।

শুধু একজনের সাথে আজীবন বিবাহের রজ্জুতে ঝুলে থাকা ভাল, না বহুবিধ জীবন ভাল? কাকেও বিবাহ করার আগে অনেকেই চায় তার সাথে প্রাথমিক সম্পর্ক। এই প্রাথমিক সম্পর্ক খুবই দরকারী এবং একটি প্রশংসনীয় কাজ। এটাকেও যদি কেহ সমস্যা মনে করেন তবে সেটা করছেন এজন্য যে আমরা যেন কোন নষ্ট মেয়ের খপ্পরে না পড়ি। এটা একটি পলায়নপর মনবৃত্তি। এটা

একটি অন্যায়। তবে তা কারো সাথে যৌন সম্পর্ক ঘটে যাওয়ার জন্য নয়; বরং তা কারো সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা থেকে সরে পড়ার মনোবৃত্তির কারণেই। তাই সমস্যা থেকেই যাবে।

আমাদের সকল আত্মীয়তার সম্পর্ক অতিরিক্তভাবে সংরক্ষিত রাখার প্রবণতা রয়েছে। আমরা চাই এটাকে শিথিল করে দিতে, যাতে সকলে খোলাখুলি ও সরাসরি যৌন আবেদন প্রকাশ করতে পারে। নারী ও পুরুষের এ ধরনের স্বাধীনতা কি আমেরিকার সনাতন পরিবার পদ্ধতিকে ভেঙ্গে দিবে? আমি তো তাই মনে করি। কারণ, এই পরিবার প্রথা এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা নানা সমস্যার সুতিকাগার। অভাব, অভিযোগ ও দক্ষতার প্রকাশ এবং অনেকগুলো মানুষের একত্র বাস ও রুজী রোজগারের এক গোষ্ঠীগত প্রচেষ্টার পরীক্ষণ কেন্দ্র এই পরিবার।"

ভাগ্যিস, মুসলিম দেশগুলোতে এখনো নারীবাদী আন্দোলন এতটা চরম আকার ধারণ করেনি। কিন্তু আধুনিকীকরণ তথা পাশ্চাত্যকরণ নীতির ফলে পর্দা প্রথার দ্রুত অবলুপ্তি ঘটছে, মহিলারা ধর্মীয় ঐতিহ্যের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে উঠছে এবং পশ্চিমা মেয়েদের ধাঁচে তারা নিজেদেরকে গড়ে তুলছে।

নিউ ইয়র্ক থেকে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত রাফায়েল পটাই লিখিত "আধুনিক বিশ্বে নারী" নামক বইয়ে বর্ণিত হয়েছে ঃ

"শহুরে ধনাঢ্য ও প্রচলিত রীতি সম্পন্না মহিলারা, বিশেষ করে তেহরান শহরে এ ধরনের মহিলারা এখন ঘর কন্যার কাজে খুব সামান্য সময়ই ব্যয় করেন। তারা প্রায় সারাক্ষণই সামাজিক, পেশাগত, বিনোদনমূলক ও জনকল্যাণধর্মী কাজে ব্যস্ত থাকেন। পোষাক প্রস্তুতকারী ও চুল পরিচর্যাকারীর কাছে যাওয়া, বন্ধু-বান্ধবীদের সাথে সকালের নাস্তা ও দুপুরের খাবারের জন্য হোটেল রেস্তোরাঁয় যাতায়াত এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ এ সকল মহিলাদের নিত্যদিনকার কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ ছাড়াও তারা খেলাধুলা ও ছুটি উপভোগের জন্য ঘরের বাইরে কাটাচ্ছেন। এই শ্রেণীর এক বিরাট সংখ্যক মহিলা সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণ কাজের প্রতি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়ছেন। (পৃঃ ৭৭)।

লেবাননের বিভিন্ন শহরে ঘর বহির্মুখী মহিলাদের সংখ্যা ব্যাপক হারে বেড়ে চলছে। প্রতি রোববারে বৈরুতের সমুদ্র সৈকত সমূহে যত সংখ্যক জনসমাগম হচ্ছে তার মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা পুরুষদের চেয়ে মোটেই কম নয়। এরা সকলেই প্রায় নতুন প্রজন্মের অল্প বয়সী তরুণ তরুণী।

সৈকতের এই মেলামেশা নিঃসন্দেহে সামাজিক বাঁধনের শৈথিল্যের প্রমাণ। লেবাননে পাশ্চাত্যমুখী উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মহিলাদের পোশাক পরিচ্ছদের ধরণ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, যে সকল মেয়ে উত্তেজক পোশাক পরে ঘোরাফেরা করতে চায় তাদেরকেও তেমন কোন বাধা দেয়া হয় না। সমাজের প্রায় সকল শ্রেণীর মেয়েরাই পোশাক পরিচ্ছদে অদ্ভূত রকমের তন্ময়তা প্রকাশ করছে, যা শুধু সমুদ্র সৈকত কিংবা বিনোদন কেন্দ্রই নয় বরং সকল অনুষ্ঠানাদিতেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা শীতকালে শীতের পোশাক পড়েন ঠিকই, কিন্তু গ্রীষ্মকালে তারা পড়ছেন সিল্কের আঁটসাঁট পোশাক কিংবা স্কার্ট ও পাতলা ব্লাউজ। এর সাথে থাকছে হিলতোলা জুতা, নাইলনের মুজা ও আকর্ষণীয় মেকআপ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী নয় এমন কিছু সংখ্যক মুসলিম মেয়েরা মুখের ওপর খুবই পাতলা ও প্রতীকি নেকাব ঝুলিয়ে দিয়ে থাকেন। এই ক'বছর আগেও মেয়েরা সমুদ্র সৈকতে স্নান করতে, বিশেষ করে রৌদ্রস্নানের খাটো স্কার্ট পড়ে স্নান করতে লজ্জা বোধ করতো। এখন তারা এটাকে লুফে নিচ্ছে এবং অনেকেই খুব খাটো টুপিস পড়ে সমুদ্র স্নানে নামছে।"

নারীবাদ (Feminism) প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙে দেয়ার জন্য একটি অস্বাভাবিক, কৃত্রিম ও উদ্দেশ্যমূলক আন্দোলনের ফসল। এর লক্ষ্য হল সকল অদৃশ্য বিশ্বাস, নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে অস্বীকার করা। নৃবিজ্ঞান ও ইতিহাসের ছাত্রছাত্রীরাই এই নারীবাদী আন্দোলনের অসারতা ও অযৌক্তিকতার পক্ষে নিশ্চিত ধারণা দিতে পারবেন। কারণ, প্রাগৈতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগের সকল মানব সভ্যতা ও মানুষের আচরণ থেকে এটা অত্যন্ত পরিষ্কার যে, সমাজে নারী ও পুরুষের মধ্যে একটি ব্যবধান থাকবেই এবং নারী ও পুরুষ এই দুই পৃথক সত্ত্বার সমন্বয়েই সমাজ গড়ে ওঠে। ... পরিবারের পৃথিকীকরণ, পরিবারে পিতার কর্তৃত্বের বিলোপ এবং যৌন ...

যে সকল সমাজে ব্যাপক হারে প্রচলিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত সে সকল সমাজই অধঃপতিত ও ধ্বংস হয়েছে।

কেউ হয়তো বলবেন, যদি তাই হয় তবে কিভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা তার নৈতিক অবক্ষয় ও দুর্নীতি সত্ত্বেও বিশ্ব নেতৃত্বের ক্ষেত্রে এত বেশী গতিশীল, বলবান ও শক্তিধর হয়ে থাকলো?

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী বিরচিত 'পর্দা ও ইসলাম' পুস্তকে নারীর মর্যাদা শীর্ষক আলোচনায় এ সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে ঃ

"যখন সমাজে নৈতিক লাম্পট্যপনা, আত্মপূজা ও যৌন অবক্ষয় চরম আকার ধারণ করে; নারী-পুরুষ ও যুবক-বৃদ্ধ যৌন উন্মাদনায় হারিয়ে যায়; অর্থাৎ গোটা সমাজের মানুষ যখন পুরোপুরিভাবে যৌন বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তখন সে সমাজ স্বাভাবিকভাবেই ধ্বংসের অনিবার্য পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। যারা এ ধরনের ধ্বংসশীল সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধি প্রত্যক্ষ করছে তারা আসলে সেই সমাজকেই দেখছে যা একটি অগ্নি গহবরের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে এবং যে কোন সময় তার সকল আত্ম-অহংকার নিয়ে তাতে নিপতিত হবে। তারা ভাবে, কোন সমাজ তখনই সম্মৃদ্ধির উচ্চ শিখরে ওঠে যখন ঐ সমাজের সকল মানুষ নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে আত্মসেবী হয়ে যায়। কিন্তু এটা একটি দুঃখজনক সিদ্ধান্ত। যখন কোন সমাজে ধ্বংসশীল ও গঠনশীল উপাদানগুলো পাশাপাশি কাজ করতে থাকে এবং গঠনশীল উপাদানগুলো ধ্বংসশীল উপাদানগুলোর ওপর কোন না কোন দিক দিয়ে অগ্রগামী থাকে তখন ধ্বংসশীল কাজগুলোকে গঠনশীল কাজগুলোর ওপর বিজয়ী হয়েছে ভাবাটা নিতান্তই অন্যায়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, একজন চতুর ব্যবসায়ী যিনি কঠোর পরিশ্রম, তীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তার দ্বারা উচ্চ অংকের মুনাফা অর্জন করছেন। কিন্তু তিনি তা ব্যয় করছেন মদ, জুয়া ও লাগামহীন জীবনাচারের মাধ্যমে। তার কর্মের এই অংশ কি তাকে কোন সমৃদ্ধি ও কল্যাণ এনে দিতে পারবে? বাস্তব সত্য কথা হল, প্রথম প্রকারের গুণ তাকে যেমন উন্নতির দিকে নিয়ে যায়, দ্বিতীয় প্রকারের গুণ তেমনি তাকে অধঃপতিত করে। ভাল গুণগুলোর কারণে তার যদি উন্নতি ঘটে তবে তার অর্থ এ হয় না যে, তার অসৎ গুণাবলী অকার্যকরী। হতে পারে জুয়ার শয়তান তার সমস্ত সম্পদ এক মুহূর্তেই কেড়ে নিবে, মদ্যপানের

ফলে তার এমন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটবে যে, সে দেউলিয়া হবে যাবে এবং এও হতে পারে যে, যৌন অপকর্মের শয়তান তাকে আত্মহত্যা, খুন বা অন্য কোন দুঃখজনক অবস্থায় ঠেলে দিবে। এখন সমৃদ্ধি, বৈভব ও আপাত ফুর্তির মধ্যে আছে বলে সে যে একদিন এ সকল দুঃখজনক অবস্থায় নিপতিত হবে না তা কেউ জোর করে বলতে পারে না। একইভাবে একটি জাতি প্রাথমিকভাবে গঠনশীল শক্তি থেকে উন্নতির উদ্যমতা পায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের অভাবে এর চারপাশে ধ্বংসের বীজ বপিত হতে থাকে। আস্তে আস্তে এই গঠনশীল শক্তি নিজ গতি হারিয়ে ফেলে এবং চারিদিকে তৎপর অপশক্তিগুলো তাকে আরো দুর্বল করে দিতে দিতে এক সময়ে ধ্বংসের অতল গহবরে নিক্ষেপ করে।"

মানবতার মুক্তি কোথায় নিহিত? সমাজ গঠনের দিক দিয়ে ইসলামী শরীয়া পরিবারকে সমাজের মৌলিক ইউনিট হিসেবে প্রাধান্য দেয়। এই পরিবার শব্দটি একটি বৃহৎ অর্থ বহন করে। এটা বর্তমান সময়ের আণবিক ও পারমাণবিক আকারের কোন পারিবারিক ধারণা নয়।

স্থানীয় অধিবাসী ও বদ্দু আরবদের মধ্যে প্রচলিত সকল রকম রেওয়াজ ও কু-সংস্কারের মূলোচ্ছেদ করে পুরোপুরি ধর্মের ভিত্তিতে নতুন একটি সমাজ গড়ে তুলতে পারাই ছিল মদীনায় মহানবী (স) এর বড় সাফল্য। নতুন এই সমাজের বন্ধন একদিকে যেমন ছিলো গোটা মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে সংশ্লিষ্ট, অন্যদিকে তেমনি তা ছিল প্রত্যেকটি মুসলিম পরিবারের সাথে সংযুক্ত। মুসলিম পরিবারগুলো হচ্ছে মুসলিম সমাজের এক একটি ক্ষুদ্র চিত্র ও সমাজের মূল ভিত্তি। ইসলামের গোষ্ঠিতান্ত্রিক প্রকৃতিতে পিতা হচ্ছেন পরিবারের ইমাম বা নেতা। পরিবারের ধর্মীয় কর্মকান্ডের মূল দায়িত্বশীল ব্যক্তি তিনিই। পিতা পরিবারের ধর্মীয় বিশ্বাস, আচরণ ও নিয়ম নীতি তুলে ধরেন এবং তার বাস্তবায়ন ঘটান। পিতা পরিবারে আল্লাহরই প্রতিনিধি, তার কর্তৃত্ব প্রতীকী অর্থে আল্লাহরই কর্তৃত্ব। একজন পুরুষ পরিবারে সম্মানার্থ হন এ জন্য যে, তিনি পরিবারের ধর্মীয় গুরু। পরিবারের সদস্যদের ধর্মীয় সকল প্রয়োজন তিনিই পুরণ করেন। পুরুষরা যখনই পরিবারের এই ধর্মীয় প্রয়োজন পুরণে বিরত হল এবং পুরুষোচিত কর্তৃত্ব পালনে ব্যর্থ হল, তখনই মুসলিম দেশগুলোতে কোথাও

কোথাও মহিলারা ধর্মদ্রোহী আচরণ করতে সাহস পেল। আর এ সকল পুরুষরা ঐ সকল 'উন্নত' মহিলাদের অধার্মিক আচরণের জবাব দিল নিজেদের পুরুষত্বকে বিসর্জন দিয়ে মহিলাদের অনুগামী হওয়ার মাধ্যমে।

১৯৬৬ সনে লন্ডনে প্রকাশিত সাঈয়েদ হোসেইন নছর রচিত "ইসলামের আদর্শ ও বাস্তবতা" (Ideals and realities of Islam) নামক পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে ঃ

'ঐতিহ্যবাহী সনাতনধর্মী পরিবার স্থিতিশীল সমাজেরই এক একটি ইউনিট। একজন মুসলিম পুরুষ এক সংগে যে চারটে বিয়ে করতে পারে তা যেন চার কোণা কাবাগৃহের মতই স্থায়ীত্বের প্রতীক। অনেকে হয়তো বুঝে উঠতে পারেন না যে, ইসলাম কেন এ ধরনের পারিবারিক কাঠামো অনুমোদন করে এবং এ কারণেই তারা ইসলামের বহুবিবাহ প্রথাকে সমালোচনা করে থাকেন। মুসলিম আধুনিকতাবাদীরা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মত এ জন্য ইসলামের ওপর বিদ্বেষ পোষণ করেন, এমনকি তারা বহুবিবাহ প্রথাকে অনৈতিক বলেও দাবী করেন।

অবৈধ যৌন সম্পর্ক কমিয়ে আনার জন্য তারা পাঁচ মিশালী যৌনতাকে (Promiscuity) পর্যন্ত সামাজিক কাঠামোতে নিয়ে আসতে সুপারিশ করে থাকেন। এ ক্ষেত্রে পশ্চিমা পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিভংগি যতটা না মারাত্মক তার চেয়ে ঢের বেশি ক্ষতিকর এই আধুনিকতাবাদী ক্ষুদ্র মুসলিম সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভংগি। কারণ, তারা ইসলামী শরীয়ার শিক্ষাকে বুঝতে চান না এবং আধুনিক পাশ্চাত্য শ্রেণীগত ধারণার ওপর শরীয়াকে কোন মতেই স্থান দিতে রাজী নন।

নিঃসন্দেহে বর্তমান মুসলিম সমাজের একটি ক্ষুদ্র, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ অংশের মহিলারা প্রচলিত ও ঐতিহ্যগত ইসলামী প্রথার বিরুদ্ধাচারণ করছে। প্রত্যেক সভ্যতার ইতিহাসেই দেখা যায় বিদ্যমান শক্তির বিরুদ্ধে একটি প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর তৎপরতা চালু রয়েছেই। হিন্দু ধর্মে সব সময়ই দেখা যায় মাতৃত্বের দিকটা শক্তিশালী। কিন্তু ইসলাম ধর্মে পুরুষের কর্তৃত্বই প্রধান। আধুনিকতাবাদী উগ্র প্রকৃতির মহিলারা ইসলামের এই প্রথাটিকে আক্রমণের সবচেয়ে বড় বিষয় বানিয়েছেন। এই চৌদ্দশত বছর ধরে মুসলিম সমাজের ভিতরকার শত্রুরা মুসলিম সমাজকে ভেঙে দেয়ার জন্য যে প্রচেষ্টা চালিয়েছে আধুনিকতাবাদী এই মুসলিম মহিলাদের বিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে তারই ফল। পুরুষ

কর্তৃত্ববাদই এ সকল মহিলাদের প্রতিক্রিয়াশীল হওয়ার কারণ। পুরুষদের চেয়ে অতি নগণ্য সংখ্যক এই মহিলারা চাচ্ছেন যে তাদের সব কিছুই হোক পশ্চিমা ধাঁচের। তারা প্রচন্ড আবেগের সাথে স্বভাবে ও পোশাকে পশ্চিমা হয়ে যেতে চাচ্ছেন। এই ভাবাবেগের কারণ বুঝা কঠিন হবে যদি এর পেছনে নিহিত মানসিক কারণগুলো বিশ্লেষণ করা না হয়।

ইসলামী দৃষ্টির বিচারে নারী ও পুরুষের সাম্য কথাটি গোলাপ ও জুঁই এর গুণাগুণ সমান বলার মতই একটি অযৌক্তিক কথা। কারণ, এ দু'টো ফুলেরই রয়েছে পৃথক পৃথক ঘ্রাণ, বর্ণ, আকৃতি ও সৌন্দর্য। তেমনি নারী-পুরুষও এক নয়। এদের প্রত্যেকেরই রয়েছে ভিন্ন গঠন প্রকৃতি ও আচার আচরণ। মহিলারা যেমন হতে পারে না পুরুষের সমান, তেমনি পুরুষেরাও হতে পারে না মহিলাদের সমান। ইসলাম তাই এদের উভয়কে সমাজে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় না করিয়ে বিবেচনা করেছে একে অন্যের সহযোগী হিসেবে। নিজস্ব গঠন প্রকৃতি অনুযায়ী এদের প্রত্যেকের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছে পৃথক পৃথক দায়িত্ব ও কর্তব্য।

পুরুষের যেহেতু বহু গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ সম্পাদন করতে হয়; তাই তাকে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের মত কিছু সামাজিক প্রাধান্য ও সুবিধা ভোগের সুযোগ দেয়া হয়।

প্রথমতঃ তাকে অর্থনেতিক গুরু দায়িত্ব বহন করতে হয়। পরিবারের সার্বিক ব্যয় নির্বাহের দায়িত্বই তার। অপরদিকে স্ত্রী যদি ধনী হন, এমনকি তিনি যদি আর্থিকভাবে স্বাধীন হয়েও থাকেন, তবুও তার ভরণ পোষণের দায়িত্ব স্বামীর ওপর। আদর্শবাদী মুসলিম সমাজে নারীকে জীবিকার জন্য কোন দুঃশ্চিন্তা করতে হয় না। এখানে এমন বৃহত্তর পারিবারিক পরিসর রয়েছে যে, কোথাও না কোথাও সে তার স্থান করে নিতে পারবে। এমনকি তার স্বামী বা পিতার অবর্তমানেও এই পারিবারিক পদ্ধতি তার আশ্রয়ের এবং অর্থনৈতিক চাপ থেকে আত্মরক্ষার পথ বের করে দিবে। এই বৃহত্তর ইসলামী পরিবারে একজন দায়িত্বশীল শুধু তার স্ত্রী ও সন্তানদের লালন পালনের দায়িত্ব বহনই করেন না, বরং প্রয়োজনবোধে তার মাতা, ভগ্নি, ফুফু, খালা, শালী, শ্বাশুড়ী এবং এমনকি চাচাতো-মামাতো বোন ও আরো দূরের আত্মীয় স্বজনদের পর্যন্ত সহযোগিতা

করে থাকেন। সুতরাং শহুরে জীবনে যেমন একজন মুসলিম নারীকে সকল শক্তি ব্যয় করে চাকুরী খুঁজে বের করতে এবং জীবনের সকল আর্থিক দায়ভার নিজ কাঁধে বহন করতে হয় না, তেমনি গ্রাম্য জীবনে প্রতিটি পরিবারই এক একটি অর্থনৈতিক ইউনিট হওয়ায় পরিবারের সকল প্রয়োজন ভেতর থেকে অথবা যৌথ প্রচেষ্টায় অর্জিত হয়। ফলে নারীকে অনর্থক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে জড়াতে হয় না।

দ্বিতীয়তঃ একজন মুসলিম নারী তার নিজের জন্য নিজেই একজন স্বামী খুঁজে নিতে পারে না এবং সে তার সৌন্দর্যের প্রদর্শনীও করতে পারে না- যা দিয়ে কাকেও আকৃষ্ট করে ভবিষ্যতে তাকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার আশা পোষণ করতে পারে। ফলে একজন মুসলিম নারী কাউকেও স্বামী হিসেবে খুঁজে পাওয়ার ভয়াবহ দুঃশ্চিন্তা এবং না পাওয়ার দুঃসহ বেদনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। নারীর স্বাভাবিক চারিত্রিক দাবী অনুযায়ী তার পিতা-মাতা বা অভিভাবকগণ তার জন্য কোন উপযুক্ত বর খুঁজে না আনা পর্যন্ত সে গৃহেই অবস্থান করে থাকে। এ ধরনের বিবাহই হয়ে থাকে প্রকৃত ধর্মসম্মত বিবাহ এবং এতেই স্থায়ীত্ব পায় পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন। মুহূর্তের আবেগের বশে যে সকল বিবাহ সংঘটিত হয় সেগুলো প্রায়শই স্থায়ী হতে পারে না। কিন্তু অভিভাবকদের স্থির বিবেচনার মাধ্যমে সংঘটিত বিবাহসমূহ প্রায়শই স্থায়ী হয় এবং এ সকল বিবাহে সাধারণত তালাকের ঘটনা ঘটে না।

তৃতীয়তঃ বিরল দু'একটি প্রয়োজন ছাড়া মুসলিম মহিলাগণ রক্তাক্ত যুদ্ধ ও রাজনীতিতে সরাসরি অংশগ্রহণ থেকে মুক্ত। এটাকে অনেকের কাছে একটি বঞ্চনা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু নারী প্রকৃতির প্রকৃত প্রয়োজনের আলোকে বিচার করলে দেখা যাবে যে, অধিকাংশ নারীর পক্ষেই এ সকল কাজে অংশগ্রহণ খুবই ভারী ও কঠিন বলে প্রমাণিত। এমনকি আধুনিক সে সকল সমাজে 'সমতাবাদী' পদ্ধতিতে নারী ও পুরুষকে সমান করার প্রক্রিয়া চলছে যে সকল সমাজেও চরম কোন অবস্থা না দেখা দেয়া পর্যন্ত মহিলাদেরকে সামরিক বাহিনীতে অংশগ্রহণ থেকে দূরে রাখা হচ্ছে।

'ইসলামের আদর্শ ও বাস্তবতা' গ্রন্থের অন্যত্র সাঈয়েদ হোসেইন নছর বলেন, "ইসলাম নারীকে যে সকল সুযোগ সুবিধা দিয়েছে তার প্রতিদানে তাকে

কয়েকটি নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালন করতে হয়। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পরিবারের জন্য একটি শান্তির নীড় উপহার দেয়া এবং সন্তানদেরকে সঠিকভাবে মানুষ করে তোলা। পরিবারে স্ত্রীর ভূমিকা হয় সম্রাজ্ঞীর মত। আর পুরুষ তার পরিবারে হয় স্ত্রীর সম্মানিত মেহমান। গৃহ এবং যে বৃহৎ পারিবারিক পরিমন্ডলের মধ্যে সে বাস করে তা-ই হচ্ছে মুসলিম নারীর দুনিয়া। নারীর জন্য গৃহ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানে হচ্ছে দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা মৃত্যুর বুকে ঝাঁপ দেয়া। মুসলিম নারী বৃহৎ পারিবারিক অবকাঠামোর মধ্যেই তার অস্তিত্বের মর্ম খুঁজে পায় এবং এই পরিবারের মধ্যেই রয়েছে তার সকল প্রয়োজন পুরণ ও আত্মতৃপ্তির উপাদান।

শরীয়াহ নারী ও পুরুষের প্রকৃতি অনুযায়ী একে অপরের পরিপূরক হিসেবে সমাজে তাদের কর্ম ও অবস্থান নির্দেশ করে। এটি পুরুষকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্ব প্রদান করে এ জন্য যে, সে তার পরিবারের সকল দায়-দায়িত্ব বহন করে এবং পরিবারকে আর্থিক, সামাজিক ও অন্যবিধ সকল চাপ থেকে রক্ষা করে। যদিও পুরুষ গৃহের বাইরের রাজ্যে রাজত্ব করে এবং পরিবারের সে কর্তা, তথাপি গৃহে স্ত্রীর অনুশাসন সে শ্রদ্ধার সাথে মেনে চলে।

মহান আল্লাহ নারী ও পুরুষের ওপর পৃথক পৃথক ভাবে যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন প্রতিটি মুসলিম পরিবারে স্বামী ও স্ত্রী তা পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমে মেনে নিয়ে এমন একটি দৃঢ় ভিত্তি সম্পন্ন পরিবার গড়ে তোলে যা হয় গোটা সামাজিক সুষ্ঠু কাঠামোর জন্য এক একটি মৌলিক ইউনিট।"

খৃষ্টান জগতে যারা নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের সমর্থক তারা নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের প্রতি বিদ্রোহ ও পারিবারিক পদ্ধতির অপরিহার্যতাকে অস্বীকৃতির মাধ্যমে আসলে নিজ সভ্যতার গোটা উত্তরাধিকারকেই অস্বীকার করছে এবং তার প্রতি বিদ্রোহী হয়েছে।

আধুনিক ইউরোপ এ কথা ভাল করেই জানে যে, মধ্যযুগীয় খৃষ্টান সমাজে সামন্ত প্রথার অনিষ্টকারিতা এবং যাজকদের অত্যাচার সত্ত্বেও সামাজিক সংহতি, শান্তি, স্থায়িত্ব ও একতা বিরাজমান ছিল। মধ্যযুগীয় ইউরোপে খৃষ্টান পরিবারগুলোতে যে সকল মূল্যবোধ আচরিত হতো তার একটি উজ্জ্বল বর্ণনা বিখ্যাত জার্মান চিত্রশিল্পী আলব্রেট ডিউরার (১৪৭১-১৫২৮), যিনি একজন ধর্মনিষ্ঠ খৃষ্টান ছিলেন- তার পারিবারিক ঘটনাপঞ্জী থেকে নিম্নে উদ্ধৃত হল।

ডিউরার পরিবারের এক সদস্যের বর্ণিত এই পারিবারিক জীবন ইসলামী পারিবারিক পদ্ধতির খুবই কাছাকাছি।

"আমার শ্রদ্ধেয় পিতা, আলব্রেট ডিউরার জার্মান গেলেন এবং সেখানে এক নীচু পল্লী এলাকায় দীর্ঘদিন অবস্থান করলেন। তারপর তিনি ১৪৫৫ সনের সেন্ট ইলিজিয়াস দিবসে (২৫শে জুলাই) নিউরেমবার্গ চলে এলেন। ঐদিন ছিল ফিলিপ পার্কিমারের বিবাহের দিন। এ জন্য বাড়ী সাজানো হয়েছিল এবং বৃহৎ লাইম গাছের নীচে মেহমান অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এরপর থেকে ১৪৬৮ সন পর্যন্ত দীর্ঘ বছর আমার প্রিয় পিতা আলবার্ট ডিউরার বৃদ্ধ হাইরনোনাইমাস হপারের দেখাশুনা করেন। এরপর হপার তার ১৫ বছরের সুশ্রী, সুঠাম ও ধার্মিক কন্যা বারবারাকে তার সাথে বিয়ে দেন। এই বিয়ে হয়েছিল সেন্ট ভাইটাস দিবসের (৮ই জুনের) ৮ দিন আগে। আমার এই মহিয়ষী মা ৮টি সন্তান জন্মদান করেন এবং তাদেরকে বড় করে তুলেন। কখনো তাকে সম্মুখীন হতে হয়েছে সংক্রামক ব্যাধি ও মারাত্মক অসুস্থতার এবং সহ্য করতে হয়েছে প্রচন্ড অনাহার, বিদ্রুপ, উপহাস, অবজ্ঞা ও উদ্বিগ্নতা; কিন্তু তিনি কখনো অন্তরে পোষণ করেননি কোন অস্থিরতা ও প্রতিশোধ স্পৃহা। আমার প্রিয় পিতার সন্তান, আমার এই ভাই ও বোনেরা সকলেই মারা গেছে কেউ অল্প বয়সে আর কেউ বড় হয়ে। শুধু আমরা তিন ভাই এখনো বেঁচে আছি এবং ততদিন বেঁচে থাকবো যতদিন প্রভু চাইবেন। আমরা এই তিন ভাই হচ্ছি আমি আলব্রেট, আমার ভাই অ্যান্ড্রেয়াস ও আমার ভ্রাতৃতুল্য হ্যানস। হ্যান্স আমার পিতার সন্তান নন। আমার পিতা ছিলেন তার ভাইদের মধ্যে জৈষ্ঠ্য। সারা জীবনই তিনি কঠোর পরিশ্রম করে গেছেন। নিজের এবং তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণ পোষণের জন্য নিজ হাতেই রোজগার করেছেন। তার জীবনে ছিল অনেক দুঃখ, প্রলোভন ও প্রতিকুলতা।

ঈশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞ, মানুষের প্রতি কল্যাণময়ী, ধৈর্যশীল, বিনম্র এই মানুষটি ছিলেন একজন আদর্শ খৃষ্টান। তাকে যারাই জানতো তারা সকলেই তার প্রশংসা করতো। সমাজের কাছে তার সামান্যই চাওয়া পাওয়া ছিল। তিনি ছিলেন খুব কম কথার লোক ও খোদাভীরু মানুষ। আমার এই মহান পিতা তার সন্তানদেরকে খোদাভীরুতা শিক্ষা দেয়ার জন্য খুবই পেরেশান ছিলেন। তার

সবচেয়ে বড় আশা ছিল তার সন্তানদেরকে খোদা ও মানুষের দৃষ্টিতে কল্যাণধর্মী করে গড়ে তোলা। এ জন্য তিনি সব সময় আমাদেরকে উপদেশ দিতেন ঈশ্বরকে ভালবাসতে এবং মানুষের সাথে সদাচারণ করতে। আমি শিক্ষার প্রতি খুবই আগ্রহী ছিলাম বলে তিনি আমার প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। এ জন্যই তিনি আমাকে স্কুলে পাঠালেন। যখন আমি পড়তে ও লিখতে শিখলাম তখন তিনি আমাকে স্কুল থেকে নিয়ে এলেন এবং স্বর্ণকারের শিক্ষা ও কলাকৌশল শিখালেন। যখন আমি এই বিদ্যায় পারদর্শী হলাম তখন আমি অনুভব করলাম যে, স্বর্ণকারের চেয়ে চিত্রকর হওয়াই ভাল। যখন আমি এ কথা আমার পিতাকে জানালাম তখন তিনি তা শুনে খুশী হতে পারলেন না এবং তাঁর অধীনে শিক্ষানবিস হিসেবে যে সময় হারিয়েছি তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আমাকে আমার ইচ্ছামত অগ্রসর হতে অনুমতি দিলেন এবং ১৪৮৬ সনের সেন্ট এন্ড্রিট দিবসে (৩০শে নভেম্বর তারিখে) আমার পিতা আমাকে মিখাইল ও লজিমিউটের অধীনে তিন বছরের জন্য শিক্ষানবিস নিয়োগ করলেন। এই সময়েও প্রভু আমাকে পরিশ্রম করার শক্তি দিলেন এবং আমি বিষয়টি ভালভাবে শিখলাম। কিন্তু আমার শিক্ষকের সহযোগীদের হাতে খুবই অত্যাচারিত হয়েছিলাম। শিক্ষা শেষে আমি যখন ঘরে ফিরলাম তখন হ্যানসফ্রে আমার পিতার সাথে আলাপ আলোচনা করে তার কন্যা অ্যাগনেসকে আমার সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নিলেন। অ্যাগনেসের সাথে তিনি আমাকে ২০০ ফ্লোরিনও দান করলেন। ১৪৯৪ সনের সেন্ট মার্গারেট দিবসের কিছু আগে ৭ই জুলাই সোমবার আমাদের এই বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

এর কিছুকাল পর আমার পিতা আমাশয় রোগে আক্রান্ত হলেন এবং কারো চিকিৎসাতেই তিনি সুস্থ হলেন না। যখন তিনি দেখলেন যে, মৃত্যু এসে যাচ্ছে তখন তিনি তার কাছে নিজকে খুব শান্তভাবে ও ধৈর্য্যের সাথে সমর্পণ করলেন এবং আমাকে আমার মায়ের যত্ন নিতে এবং আমাদের সকলকে খোদার বিধান মত জীবন-যাপন করতে নির্দেশ দিলেন। তার জীবনের শেষ স্যাক্রামেন্টস দিবস (খৃষ্টেয় ভোজ দিবস)' অতিবাহিত হল এবং তিনি বরণ করলেন একজন খৃষ্টান ধার্মীকের মরণ। রেখে গেলেন আমার মাকে একজন বেদনার্ত বিধবা হিসেবে। আমার পিতা জীবিতাবস্থায় সব সময়ই আমার নিকট আমার মায়ের ভূয়সী প্রশংসা করতেন। তিনি বলতেন 'তোমার মা একজন খুবই ভাল

মেয়েলোক।' এ জন্যই আমি আমার মাকে কখনো ভুলে না থাকার সংকল্প করেছি।

হে আমার বন্ধুগণ, আমি তোমাদেরকে ঈশ্বরের নামে বলছি, তোমরা যখন আমার এই ধার্মীক পিতার মৃত্যুর কাহিনী পড়বে তখন তোমরা তার পারলৌকিক কল্যাণের জন্য এবং তোমাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য খৃষ্টের নিকট এবং মাতা মারিয়ার নিকট এই বলে প্রার্থনা করবে, ঈশ্বর যেন আমাদেরকে তাঁর সেবার মাধ্যমে সার্থক জীবন ও কল্যাণময় মৃত্যু দান করেন। এটা কখনো সম্ভব নয় যে, এক ব্যক্তি উত্তম জীবন যাপন করবেন আর তার মৃত্যু হবে একটা অশুভ মৃত্যু। কারণ, ঈশ্বর করুণাময়।

এখন আমি আপনাদেরকে জানাচ্ছি যে, ১৫১৩ সালের 'রোগেশন' দিবসের আগের মঙ্গলবার আমার মাতা যাকে আমি আমার পিতার মৃত্যুর দু'বছর পরই যখন তিনি কপর্দক শূন্য হয়ে গেলেন তখন আমার তত্ত্বাবধানে নিয়ে এসেছিলাম, দীর্ঘ নয় বছর আমার সেবাধীনে থাকার পর খুবই অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমরা ঐদিন সকাল বেলা তার ঘরের দরজা ভেঙ্গে তাকে ঘর থেকে বের করে আনলাম। কারণ, তিনি এতই দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন যে, দরজা খুলে দেয়ার মত কোন শক্তি তার ছিল না এবং দরজা ভেঙে বের করাই ছিল একমাত্র উপায়। আমরা তাকে নীচ তলায় নিয়ে এলাম এবং তার জন্য উভয় 'সেক্রামেন্ট (প্রভুর উদ্দেশ্যে ভোজ)' অনুষ্ঠান করা হল। কারণ, সকলেই ধারণা করলো যে, তিনি মরে যাচ্ছেন। আমার পিতার মৃত্যুর পর থেকে তিনি কখনই শারীরিকভাবে ভাল ছিলেন না।

অসুস্থ হয়ে পড়ার দিন থেকে এক বছরেরও অধিককাল পরে খৃষ্টীয় ১৫১৪ সনের ১৭ই মে রাতের আঁধার ঘনিয়ে আসার দু'ঘন্টা আগে আমার এই মহিয়ষী মা বারবারা ডিউরার ইহলোক ছেড়ে চলে গেলেন এবং পোপ ধর্মগুরুদের মাধ্যমে তার পাপ ও দুঃখ মোচনের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধানুষ্ঠান করা হল। মৃত্যুর আগে তিনি আমার জন্য আশীর্বাদ ও পারলৌকিক কল্যাণ কামনা করলেন এবং পাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকার জন্য অনেক উপদেশ দিলেন। তিনি যদিও মৃত্যুর ভয়ে খুবই ভীত ছিলেন, কিন্তু তিনি জানালেন যে, ঈশ্বরের সাথে সাক্ষাত করতে তিনি মোটেই ভীত নন। আমার মায়ের মৃত্যুতে আমি এতই ব্যথিত হলাম যে, তা

আমার পক্ষে ভাষায় প্রকাশ সম্ভব নয়। ঈশ্বর তার আত্মার মঙ্গল করুন। সর্বদা ঈশ্বরের স্তুতিকীর্তনে এবং আমরা যাতে ঈশ্বরকে শ্রদ্ধা জানাই তা দেখতে তিনি খুবই প্রশান্তি অনুভব করতেন। নিয়মিত গীর্জায় যাওয়া তার অভ্যাস ছিল। আমি কোন ভুল করে ফেললে তিনি খুবই ক্ষেপে যেতেন এবং তীব্র ভৎর্সনা করতেন। আমি এবং আমার ভাইয়েরা কোন অন্যায় কাজ করে ফেলি এ ভয়ে তিনি সব সময় ভীত থাকতেন। যখনই আমি ঘরের বাইরে যেতাম কিংবা বাহির থেকে ঘরে ফিরতাম তখনই তিনি বলতেন ঈশ্বর তোমার সহায় হউন। তিনি সব সময়ই আমাদেরকে আমাদের আত্মা, জৈবিকতা ও ধর্ম সম্পর্কে সজাগ করে দিতেন। তার সৎকর্ম, মানুষের প্রতি দয়া অথবা তার প্রশংসার দিকগুলো আমি বলে শেষ করতে পারবো না। তিনি যখন মারা গেলেন তখন তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর এবং আমি আমার সাধ্যমত খুব ভাল ভাবেই তাকে সমাহিত করলাম। মহান প্রভু আমাকেও একজন সত্যিকার খৃষ্টানের মৃত্যু দান করুন এবং তাঁর সাথে, তাঁর স্বর্গীয় সেবক আমার বাবা, মা ও বন্ধুদের সাথে মিলিত হওয়ার তাওফীক দিন এবং আমাদেরকে পারলৌকিক কল্যাণময় অনন্ত জীবন দান করুন। আমীন! আজীবন আমার মা মৃত্যুর পরপারেই অধিক সুখের স্বপ্ন দেখতেন।"

সম অধিকারবাদীদের প্রস্তাবিত অদ্বৈত-যৌনতার (Uni-sexual) সমাজ হচ্ছে এমন একটি সমাজ যেখানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিকভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকৃত নয় এবং সে সমাজটি এমন একটি সমাজ যেখানে বিবাহ, সংসার ও পরিবার, লজ্জা, সতীত্ব ও মাতৃত্ব ঘৃণীত বিষয় এবং এগুলো 'প্রগতি' ও 'স্বাধীনতার' পরিচায়ক না হয়ে বরং চরম অধঃপতনের কারণ বলেই বিবেচিত। এর ফলাফল নির্ভেজাল অরাজকতা, সীমাহীন বিশৃংখলা ও সম্পূর্ণ সামাজিক অব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।

যদি তাই হয়, তবু কেন সম অধিকারবাদ (Feminism) এত জনপ্রিয়? লখনৌ থেকে ১৯৭০ সনে প্রকাশিত আবুল হাসান আলী নদভী বিরচিত 'ধর্ম ও সভ্যতা' প্রবন্ধে বলা হয় ঃ

"বস্তুবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থা খুবই পুরাতন এবং অধিক জনপ্রিয়। এর চেয়ে আর কোন সমাজ ব্যবস্থা কোন দেশ ও কালের অধিকাংশ

মানুষের কাছে এত বেঁশী সহজ গ্রহণযোগ্য, সন্তোষজনক ও অনায়াসে বিকাশযোগ্য বিবেচিত হয়নি। জনসাধারণের কাছে এর প্রতি মোহনীয় এমনি একটি গভীর আকর্ষণ রয়েছে যে, এর শিকড় সমাজের গভীরে প্রবেশ করাতে হয় না, কিংবা এর জন্য মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে জাগিয়ে তুলতে হয় না। অথবা এর জন্য প্রয়োজন হয় না কোন ত্যাগ ও কোরবানীর। এতে কারো জন্য কারো কোন দুঃখ-কষ্টও স্বীকার করতে হয় না। শুধু চলতে হয় সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে গড্ডালিকা প্রবাহে। ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে বস্তুবাদের ন্যায় আর কোন সামাজিক ব্যবস্থারই মানব জাতির ওপর এত অধিক ও ব্যাপক কর্তৃত্ব করার সুযোগ হয়নি।"

বর্তমান সময়ের মত কোন কালেই মানব জাতির ওপর নৈতিক অধঃপতন ও সামাজিক অবক্ষয় এত বিশ্বজনীনভাবে বিস্তার লাভ করেনি। নারী পুরুষের সাম্যতার ধারণাটি মানব জাতিকে পশুর চেয়েও নিম্নস্তরে নিয়ে এসেছে। পশু তার সহজাত প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হয় এবং তার স্বভাবের বিরুদ্ধে সে কোন কিছুই করতে পারে না। পশুদের মাঝে কোন সমকামিতা নেই। একই জাতের পুরুষ পশু শুধু ঐ জাতীয় স্ত্রী পশুদের প্রতিই আকৃষ্ট হয়। কোন পুরুষ পশু কখনোই কোন পুরুষ পশুর প্রতি এবং কোন স্ত্রী পশু কখনোই কোন স্ত্রী পশুর প্রতি কামভাব পোষণ করে না। পশুদের মধ্যে বাচ্চারা যখন বড় হয় এবং নিজেদের যত্ন নিজেরাই নিতে শিখে তখন থেকে মাতৃত্বের সম্পর্কটি সম্পূর্ণরূপে ছিন্ন হয়ে যায়। অধিকাংশ প্রজাতির পুরুষ পশুর মধ্যে ঔরসজাতকদের প্রতি কোন আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। পশুদের মধ্যে লজ্জা, সতীত্ব, বিবাহ ও কন্যাপুত্রসহ পারিবারিক বন্ধন ইত্যাদি কোন বিষয় নেই। এই ধারণা ও বন্ধন শুধু মানবীয় সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত। নারী সাম্যবাদীরা মানুষের এই মানুষ পরিচায়ক গুণাবলীকেই ধ্বংস করে দিতে এবং মানুষে মানুষে বিদ্যমান সকল সম্পর্কের ভিত্তি ও সামাজিক সকল বন্ধন ধীরে ধীরে দুর্বল করে দিতে চাচ্ছে। এর পরিণতি হবে আত্মহত্যা। আর সেই আত্মহত্যা কোন একক জাতির জন্য নয়, বরং তা হবে গোটা মানব প্রজাতির জন্য।

সমাপ্ত